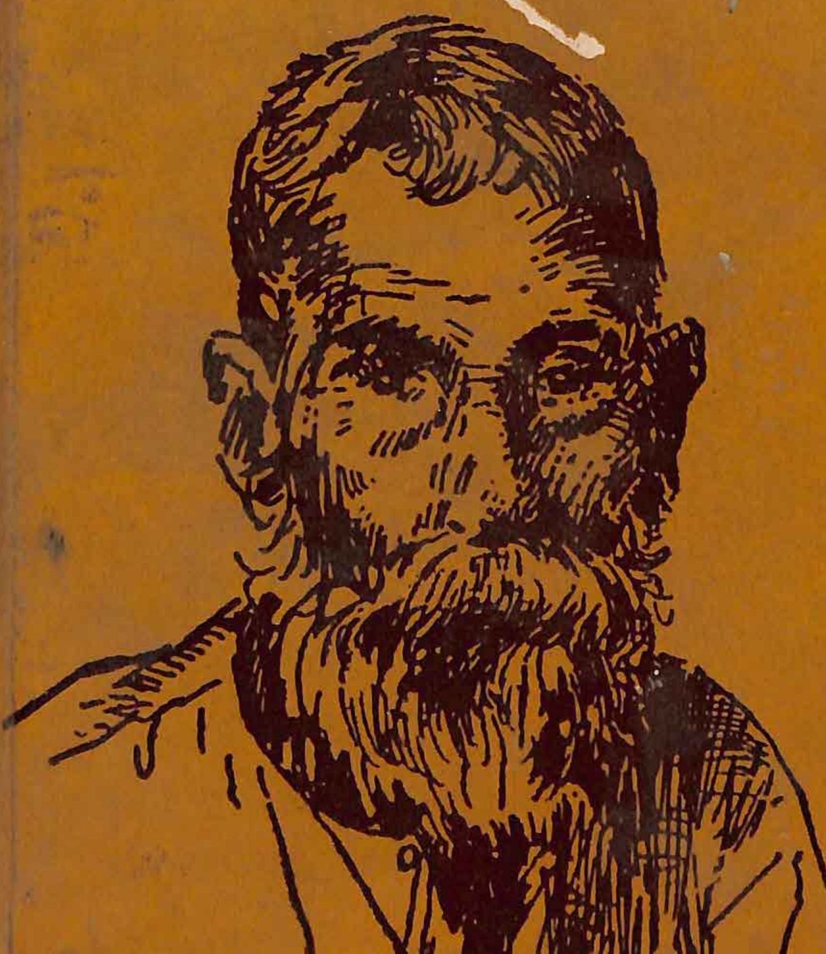
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

কিশোর রচনা সংকলন



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

কিশোর রচনা সংকলন

সঙ্কলন ও সম্পাদনা ঃ বিভাবসু ঘোষ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ রবীন বল
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা-৯

125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
প্রকাশিত—আগস্ট 1987

প্রচ্ছদ ঃ সমীর মণ্ডল

মূল্য ঃ পনেরো টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅশোককুমার চৌধুরী
চৌধুরী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
পি-২১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলকাতা-৬



'আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, সে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে। 'বাস্তব জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর গুহাস্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকের নিবেদন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কর্মবহুল জীবনের কথা আমি প্রথম শুনি আমার ছেলেবেলায়। আমার পিতৃদেবের মুখে। আমার পিতৃদেব স্বর্গত কালিদাস ঘোষ আচার্যদেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন নানা সূত্রে।

শৈশবে ছাত্রাবস্থায় পিতৃদেবের মুখেই শুনেছি আধুনিক ভারতীয় রসায়নের জনক প্রফুল্লচন্দ্রের কথা। আবার কখনও সমাজসেবায়, সমাজ সংস্কারে, জাতি গঠনে এবং দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলার ব্যাপারে তাঁর অবদানের কথা। আচার্যদেবের বহুমুখী কর্মধারার কথা শুনতে শুনতে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছিল মনে। তারপর থেকে যত দিন গেছে ততই উপলব্ধি করেছি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঠিক মূল্যায়ন হয়তো আজও হয় নি। মনে একটা সুপ্ত ইচ্ছা ছিল যে যদি কখনও সুযোগ পাই তবে দেশের মানুষের সাথে বিশেষ করে যারা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক হবে সেই কিশোরদের সাথে প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেব।

সে সুযোগ এসে গেল। শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের কর্ণধার অনুজপ্রতিম শ্রীযুক্ত রবীন বল 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কিশোর রচনা সংকলন' প্রকাশ করবেন জানালেন আর আমায় সংকলনের ও সম্পাদনার ভার দিলেন। আমিও এই সুযোগ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম।

সংকলনের কাজে হাত দিয়ে দেখা গেল কাজটা খুব সহজ

নয়। কারণ আচার্যদেবের যাবতীয় রচনা কখনও গ্রন্থাকারে বের হয় নি। তাঁর বহু রচনাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছড়িয়ে আছে। এগুলির মধ্যে একমাত্র 'মাসিক বসুমতী' ছাড়া 'বঙ্গবাণী', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হ'য়ে গেছে। এ ছাড়াও বহু ছোটখাটো পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলির সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

আচার্যদেব লিখিত 'সরল প্রাণিবিজ্ঞান' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০২ সালে। 'সরল প্রাণিবিজ্ঞান' বইখানি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী করে লেখা হয়েছিল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তুলতে তিনি কতটা সচেষ্ট ছিলেন বইখানি তার প্রমাণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুস্তকখানির সন্ধান আজও মেলেনি।

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কিশোরদের জন্য কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলন করে এই রচনা সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করছি সংকলিত প্রবন্ধগুলি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মবহুল জীবনের নানাদিকের প্রতি আলোকপাত করবে এবং কিশোর পাঠকদের প্রফুল্লচন্দ্রকে জানতে সাহায্য করবে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির বানান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত রয়ে গেছে যা—প্রবন্ধগুলির মূল ভাব বুঝতে অসুবিধা করে না—এবং সেকালের বাংলা গদ্যরীতির সঙ্গেও কিছুটা পরিচয় করিয়ে দেয়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সংকলনটিতে

ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। ভবিষ্যতে বর্ধিত কলেবর ত্রুটি বিচ্যুতি মুক্ত 'কিশোর রচনা সংকলন' প্রকাশ করবার আশা পোষণ করি। সংকলনটি শোভন ও সর্বাঙ্গসুন্দর করতে সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশেষে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই প্রফুল্লচন্দ্রের স্বগ্রামবাসী ও সেবাকার্যে তাঁর সহকর্মী স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি তাঁর পিতৃদেবকে ও হরিদাস ঘোষকে লেখা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বহস্ত লিখিত চিঠি প্রকাশে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়েছেন। আর কৃতজ্ঞতা জানাই অগ্রজপ্রতিম শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে –যিনি সর্বদাই সংকলনের কাজে উৎসাহিত করেছেন। এ ছাড়াও আর. কে. বি. কে. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনীর বহু সদস্য আমাকে বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের প্রতি রইল আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। সবশেষে শ্রীগুরুপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রবন্ধগুলি সংকলন আকারে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

যে কিশোরদের জন্য এই রচনা সংকলন তাদের দ্বারা গ্রন্থখানি সমাদৃত হলে আমার চেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

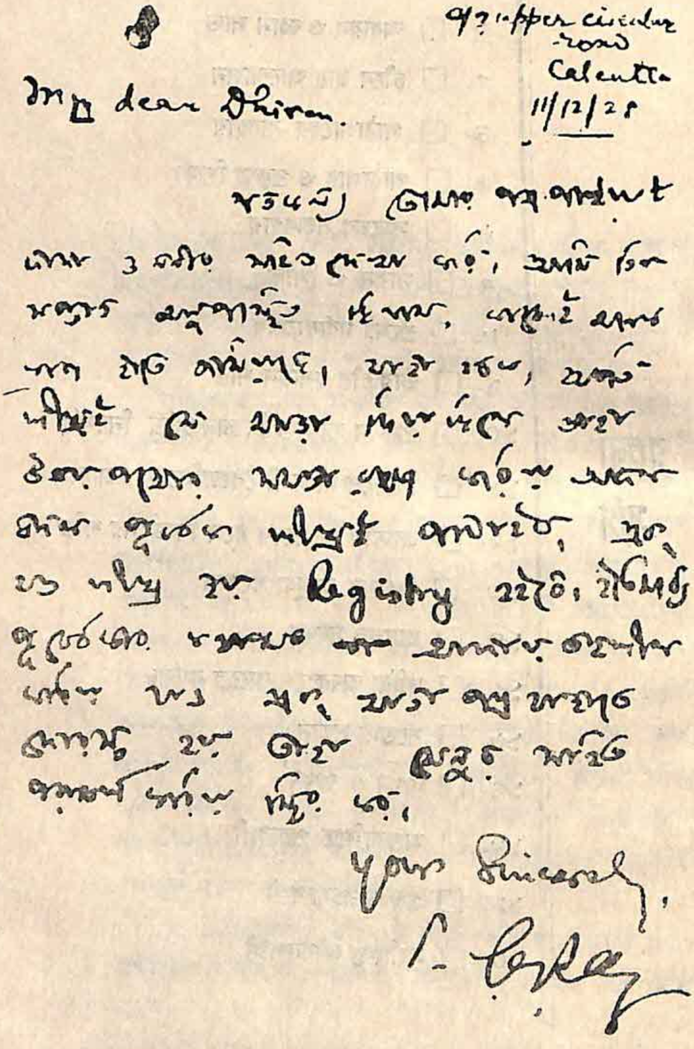
১লা আগস্ট, ১৯৮৭ **শ্রীবিভাবসু ঘোষ**

উদ্যমপুর, আগরপাড়া,

২৪-পরগনা

রচনা সূচী

আচার্যদেবের হস্তলিপি

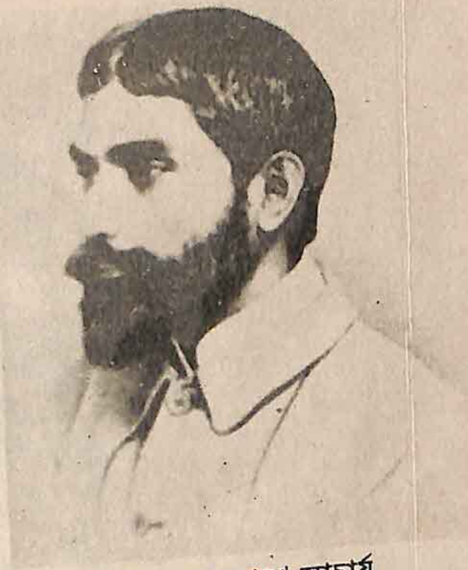

92 Upper Circular Road
Calcutta
11/12/28

My dear Dhiren

Yours Sincerely,
P. C. Ray

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ররায়ের স্বগ্রামবাসী ঃ চরকা ও গ্রামসেবা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের প্রতিলিপি

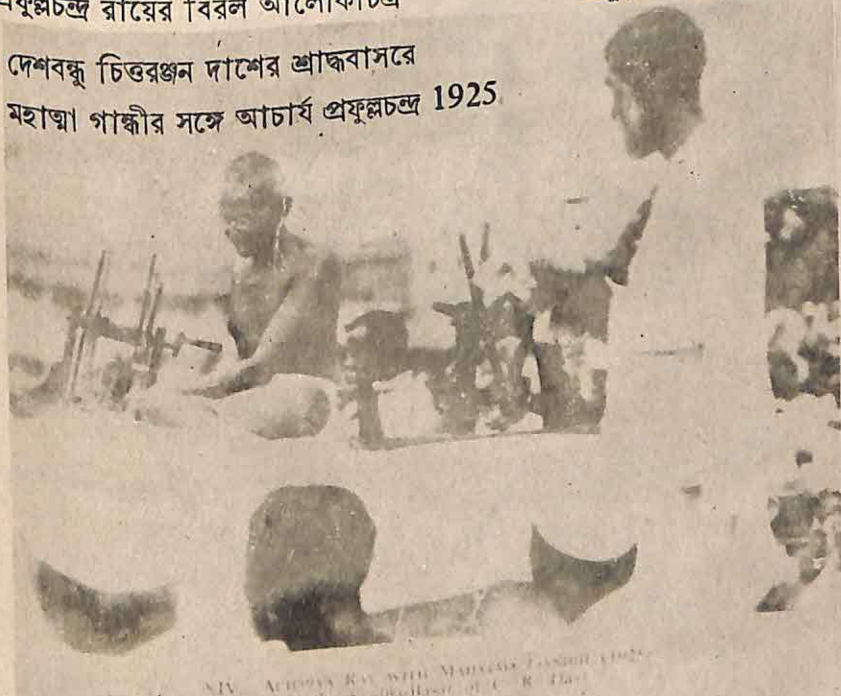


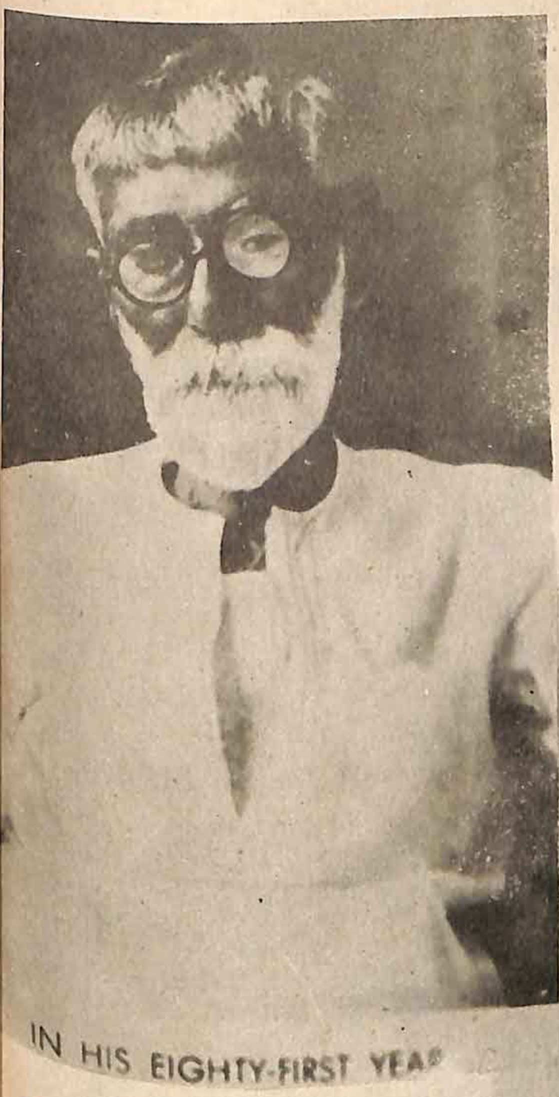


1896 সালে তোলা আচার্য
প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিরল আলোকচিত্র

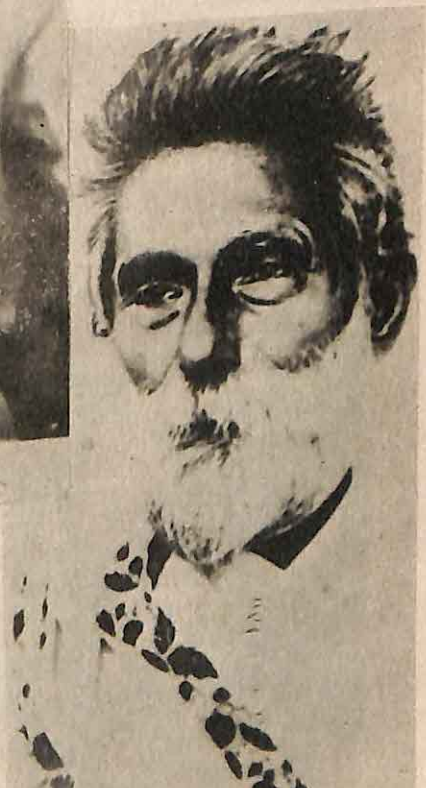
1926 সালে তোলা আচার্য
প্রফুল্লচন্দ্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে
মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 1925





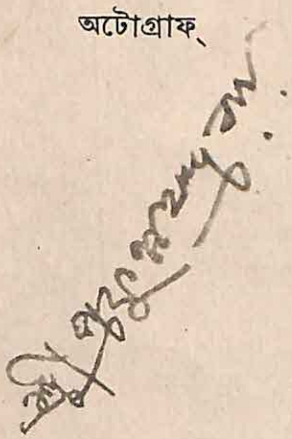
একাশীতম জন্মদিনে প্রফুল্লচন্দ্র

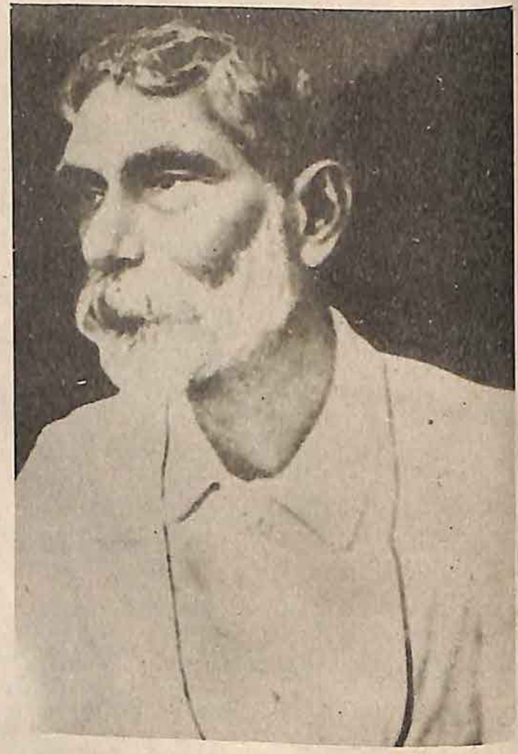


1940 সালে তোলা আরও একটি বিরল আলোকচিত্র।

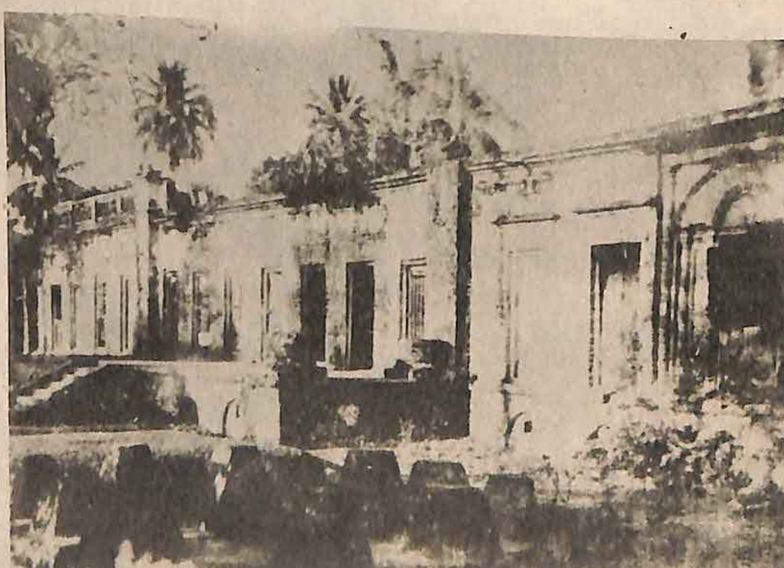
আচার্যদেব ও আচার্যদেবের

অটোগ্রাফ্





আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পৈতৃক ভিটার
বাইরের দৃশ্য।



১

আমি ও আমার কাল

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আমার পিতার বার্ষিক ছয় হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে দুই পুরুষে আমাদের পরিবার যে সম্পত্তি ভোগ করিয়াছেন, এই আয় তাহার তুলনায় সামান্য, কেননা আমার প্রপিতামহ ও পিতামহ উভয়েই বড় চাকুরী করিতেন। আমার পিতা যে অতিরিক্ত সম্পত্তি লাভ করেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, তাঁহার বিবাহের সময় আমার পিতামহ আমার মাতাকে প্রায় দশ হাজার টাকা অলংকার যৌতুক দিয়াছিলেন। আমার পিতার যে সব রূপার বাসন ছিল, তাহার মূল্যও কয়েক হাজার টাকা। আমার মনে পড়ে, আমার বাল্যকালে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে একই সময়ে রূপার থালা, বাটি ইত্যাদিতে খাদ্য পরিবেশন করা হইয়াছিল। আমার মাতার সম্মতিক্রমে তাঁহার অলংকারের কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া অন্য লাভবান কারবারে লাগানো হয়। বস্তুতঃ তাঁহার নামে একটি জমিদারীও ক্রয় করা হয়। আমার পিতা অর্থ-নীতির মূল সূত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, অলংকারের টাকা আবদ্ধ রাখা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, কেননা, তাহাতে কোন লাভ হয় না ; তাঁহার হাতে যথেষ্ট নগদ অর্থও ছিল, সুতরাং তিনি লগ্নী কারবার করেন এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাহাতে বেশ লাভ হইয়াছিল। ঐ সময়ে অল্প আয়ের লোকদের পক্ষে টাকা খাটাইবার কোন নিরাপদ উপায় ছিল না এবং চোর ডাকাতদের হাত হইতে চিরজীবনের সঞ্চিত অর্থ কিরূপে রক্ষা করা যায় তাহা লোকের পক্ষে একটা বিষম উদ্বেগের বিষয় ছিল। এই কারণেই লোকে সঞ্চিত অর্থ ও অলংকার মাটীর নিচে পুঁতিয়া রাখিত।

সুতরাং যখন আমার পিতা নিজে একটি লোন অফিসের কারবার খুলিলেন, তখন গ্রামবাসীরা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ উহাতে স্থায়ী সুদে সাগ্রহে জমা দিতে লাগিল। আমার পিতার সততার খ্যাতি ছিল। এই জন্যও লোকে বিনা দ্বিধায় তাঁহার লোন অফিসে টাকা রাখিতে লাগিল। এইরূপে আমার পিতার হাতে নগদ টাকা আসিয়া পড়িল। বহু বৎসর পরে এই ব্যবসায়ের জন্য

আমার পিতা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। আমার পিতার মোট বার্ষিক আয় প্রায় দশ হাজার টাকা ছিল। এখনকার দিনে এই আয় সামান্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেকালে ঐ আয়েই তিনি রাজারহালে বাস করিতেন। ইহার আরও কয়েকটি কারণ ছিল। আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসনকে কেন্দ্র করিয়া যদি চার মাইল ব্যাস লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, তবে আমাদের অধিকাংশ ভূ-সম্পত্তি উহারই মধ্যে পড়ে। ইহা হইতেই সহজে বুঝা যাইবে, আমার পিতা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ স্কোয়ারদের মত বেশ স্বচ্ছলতা জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করিতে পারিতেন ; কারণ এই যে, তিনি তাঁহার নিজের প্রজাদের মধ্যেই রাজত্ব করিতেন। আমাদের সদর দরজায় মোটা বাঁশের যষ্টিধারী ছয়জন পাইক বরকন্দাজ থাকিত। আমার পিতা তাঁহার কাছারী বাড়ীতে সকাল ৮টা হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বসিতেন। ঐ কাছারী যেন গম্‌গম্ করিত। তাঁহার একপার্শ্বে মুন্সী অন্য পার্শ্বে খাজাঞ্চী বসিত এবং নায়েব গোমস্তারা, প্রজা ও খাতকদের নিকট হইতে খাজনা লইত বা লগ্নী কারবারের আদায় করিত।

কাছারীতে রীতিমত মামলা মোকদ্দমার বিচারও হইত। এই বিচার প্রণালী একটু রুক্ষ হইলেও, উভয় পক্ষের নিকট মোটামুটি সন্তোষজনক হইত। কেননা, বাদী বিবাদীদের সাক্ষ্য বলিতে গেলে প্রকাশ্যেই গ্রহণ করা হইত। বিবাদের বিষয় সকলেরই প্রায় জানা থাকিত এবং যদি কেহ মিথ্য সাক্ষ্য দিয়া বিচারকের চোখে ধূলা দিতে চেষ্টা করিত, তবে তাহা প্রায়ই ব্যর্থ হইত। আর এখনকার আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি দেওয়ার যে প্রলোভন আছে, তখনকার দিনে তাহা ছিল না। অবশ্য এই বিচারপ্রণালী দোষ মুক্ত ছিল না। কেননা, তখনকার দিনে গ্রামবাসী জমিদারদের সংখ্যা বেশী ছিল না এবং এই গ্রামবাসী জমিদারের নিকটেও অনেক সময় ঘুষখোর ও অসাধু নায়েবদের মারফতেই যাইতে হইত। বলা বাহুল্য বাদী বা বিবাদীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের সুবিধার জন্য এই নায়েবদিগকে ঘুষ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইত। তবে ঐ বিচারপ্রণালীর একটা দিক প্রশংসনীয় ছিল। রুক্ষ এবং সেকেলে 'খারাপ' প্রথায় সুবিচার (বা অবিচার) করা হইত, কিন্তু তাহাতে অযথা বিলম্ব হইত না। আর ব্যাপারটা তখন তখনই শেষ হইয়া যাইত, তাহা লইয়া বেশী দূর টানা- হেঁচড়া করিতে হইত না।

সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে বাঙলার যে চেহারা আমার চোখে পড়েছে আজ তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তখন বাঙলীর ছিল গোলাভরা ধান, দেহ জোড়া স্বাস্থ্য, গোয়াল-ভরা গরু, পুকুর-ভরা মাছ। কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত সব ছিল বাঙালী। গেরস্ত ঘরে ঝি-চাকর সবই ছিল বাঙালা দেশের লোক। জাতিগত বৃত্তি মেনে তারা সুখে না হলেও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাত। গ্রামে গ্রামে ছোটখাট মুদীর দোকান ছিল তিলি সম্প্রদায়ের একচেটিয়া। একেবারে আলাদা 'মনিহারী' দোকানেরও সৃষ্টি তখন হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি তখন লোকের এত

মনিহারী জিনিসের দরকারও হোত না! বিলাসিতার মোহ পঁচাত্তর বছর আগে বাঙলাকে এমন করে পেয়ে বসে নি। লোকের আয় ছিল কম, ব্যয়ও ছিল কম। অল্প আয় নিয়েই তখনকার লোকেরা ছোট-বড় সবাই বার মাসে তের পর্ব করত। দিনের যে-কোন সময়েই অতিথি অভ্যাগত আসুক না কেন, অপরিচিত লোকের বাড়িতেও দু-চারটে ডাল-ভাত মিলত। ছোট-বড় সবাই ভিক্ষুককে দুমুঠো চাল অন্তত দিত; খালি হাতে তাদের ফিরিয়ে দিত না।

লোকের তখন স্বাস্থ্য ভাল ছিল। সারাদিন নিজের নিজের কাজকর্ম করে সন্ধ্যাবেলায় তারা কেউ-কেউ তাদের সংসারের ছোট ছোট দরকারী কাজগুলো করত। কেউ বা বসে দড়ি পাকাত, কেউ বা বৃষ্টির দিনে কাজে লাগতে পারে বলে গোলপাতার টোকা অর্থাৎ একেবারে ভারতীয় ছাতা বানাত, কেউ কেউ আবার সুতো কাটতে আরম্ভ করত। এগুলো ঠিক কাজ হিসেবে করা হোত না; এগুলো অবসর কাটানোর উপায় ছিল। পাঁচজন একত্র বসে হাতে কাজ করত আর মুখে গল্প করত। ফলে আনন্দও যেমন তারা পেত সংসারের সাশ্রয়ও তেমনি হত। যারা বুড়ো তারা হয়ত রামায়ণ মহাভারত পড়ত কিংবা গান-বাজনা করত। তখন লোকে সুরের জন্যে তত ব্যস্ত হত না—যতটা হত গানের ভাষার জন্যে। এখন যেমন গানের সুর বোঝা যায়, ভাষা বোঝা যায় না—তখন তেমন ছিল না। সুর বাজার-চলতি হলেও গানের ভাষা শুনে তারা আহা আহা করত।

গ্রামে গ্রামে বারোয়ারি উৎসব ছিল কত। যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, রামায়ণ, কবি, জারি গান এইসব গান তখন গ্রামে গ্রামে হত। খোলা জায়গায় এইসব গান হত, আশেপাশের গ্রাম থেকে অনেক লোক এসে এগুলো শুনত। যারা শুনত তারা এগুলো সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত এবং দরকারমত এইগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিজেদের জীবন চালাত।

কিন্তু আজকের দিনে অবস্থা গেছে একদম বদলে। আমার বয়স হোল আশি। আজ যদি পিছনের দিকে ফিরে তাকাই তবে বেশ বুঝতে পারি তফাৎ কতটা হয়েছে। নিজের চোখে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না এ-পরিবর্তন সত্যি সত্যি কতটা।

আজকের দিনের অবস্থা বক্তৃতা করে বলার কিছু দরকার নেই। শ্রোতারা সবাই ত নিজের চোখেই এটা দেখতে পাচ্ছেন। পেটে ভাত নেই, পরনে ছেঁড়া কাপড়, চোখে নিরাশা নিয়ে হাজার হাজার ছেলে কলকাতা শহরের একদিক থেকে আর একদিক "হা চাকরী হা চাকরী" করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ দেখলে কার না দুঃখ হয়। ভাগ্যবলে দু-চারজন যাঁরা চাকরী পেয়েছেন বা ব্যবসায় নাম করেছেন তাঁদের সংখ্যা এত কম যে আমার মনে হয় সে-কয়টাকে বাদ

দিয়েই দেশের অবস্থা আলোচনা করা ভাল। পাড়াগাঁয়ের অবস্থা আরও ভয়ানক। বৃত্তিজীবী যারা ছিল তারা আজ নিজের-নিজের পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে।

চল্লিশ বছর হোল জীবনযুদ্ধে আমার দেশবাসীর এই পরাজয়ের কথা আমি বলে আসছি—কিছু হয়েছে কিনা জানি না। এখন জীবন-সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছি—যে-কোন সময়ে ওপরের ডাক এসে পৌঁছবে। কিন্তু এখনও চুপ করে থাকতে পারি না। যে কটা দিন থাকব ঐ একই কথা বলব—ভারতবাসী এখনও ফেরো, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিল্প-বাণিজ্যে ব্যবসায়ে মন দাও তবে যদি বাঁচতে পারো—নইলে তোমাদের ভবিষ্যৎ নেই। ভারতবর্ষের গত ১৭৫ বছরের ইতিহাস বড়ই দুঃখের ; কি কুক্ষণেই আমাদের মাথায় চাকরির নেশা ঢুকেছিল তা ভাবলে দুঃখ হয়। চাকরি পেয়ে আমরা ভাবলুম দিন এমনি করেই যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য রসাতলে দিয়ে আর একটা জালে আমরা নিজেদের জড়িয়ে ফেললুম— সেটা হল জমিদারী। চাকরি আর জমিদারীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডিগ্রির মোহ এল। চাকরি করে জমিদারী কেনা হল একটা নেশা, আর ছেলেদের ইস্কুল-কলেজে পাঠাতে আরম্ভ করা হল সাধারণ নিয়ম। এই ছাত্রেরা আবার তাদের বাপপিতামহের চেয়ে একটু বেশি এগিয়ে গেল। তারা পুরোপুরি বিলাসী হল—আয়েসী হল ; ব্যবসা মানে নিন্দের জিনিস, ছোট কাজ—এই হল তাদের ধারণা। এমনি করে ক্রমাগত সাতপুরুষ ধরে, হয় চাকরি নয়ত জমিদারী এই নিয়ে মেতে রইল। এখন জমিদারী গেল দেনার দায়ে—ব্যবসা গেল বুদ্ধির দোষে।

আমি কারও নিন্দা করছি না। আমি শুধু ভুল কোথায় নিজের বিশ্বাস-মত এই কথাই বলছি। অনেক আগে যাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল তারা যদি আজও সাবধান হয় তবে হয়ত এখনও চাকা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেদিকে কারো নজর দিতে দেখছি না।

আমার বয়স হয়েছে। জরা ব্যাধির চিহ্নকে আর এখন তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারি না—তবু যদি শুনি কোথাও কেউ ব্যবসা করে উন্নতি করছে অমনি আমার আনন্দ হয়। আমি সুযোগ পেলেই সেখানে ছুটে যাই।

যদি কোনদিন আমার এই রূঢ় কথায় কারও দৃষ্টি ফেরে তবেই সার্থক হবে আমার সমস্ত সাধনা—শেষ বয়সের শেষের কথায় আমার দেশবাসীর কাছে এই আমার একমাত্র আবেদন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।

১৯৪০ সালের ৮ই ডিসেম্বর রাত্রি ৮টার সময়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা স্টেশন থেকে প্রচারিত বেতার বক্তৃতা।

২

অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ

'আমি এখনও নিজেকে ছাত্র ব'লে গণ্য করি। ঐ জীবন ত্যাগ করে একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ করেছি ব'লে মনে হয় না। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"—বাস্তবিক এই ঋষিবাক্য বড় সত্য—বড় সার কথা। আর আমাদের এই ছাত্রজীবন ও গার্হস্থ্য জীবনের পার্থক্যের প্রাচীর বড়ই অমঙ্গলকর।

ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন লোকের একটি ষ্টডী অর্থাৎ পাঠাগার থাকে। সেখানে প্রবেশ করবার অর্থ এই, আর যেন কেউ না দেখে বা ঢোকে। যেমন আমাদের দেশের ঠাকুর ঘর। ভক্ত সেখানে আপন মনে সাধনা করেন, হৃদয়-দেবতাকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করেন—কিন্তু তা লোকচক্ষুর অন্তরালে—আর কেহ দেখে না। (আমাদের পাঠাগারকে ঠাকুরঘরের পবিত্রতায় মণ্ডিত করতে হবে, তাকে নিভৃতে স্থাপন করতে হবে—যেন চপলতার গোলমাল সেখানে না পৌঁছায়।)

আমাদের দেশে অনেক ছাত্র বাড়ীতে থাকেন, আবার অনেকে মেসে থাকেন। (এখানে ছাত্রের প্রধান বিপদ এই যে তার কোন স্বতন্ত্র পাঠাগার থাকে না।) বড়লোকে বড় বাড়ীতে থাকেন—নানাকার্য্যের বন্দোবস্তের জন্য তাঁদের অনেক ব্যয় করতে হয়। (কিন্তু বাড়ীর ছেলে কিরূপে কোলাহলের বাইরে নির্জ্জনে বসে পড়বে সাধারণতঃ কোন বাড়ীতেই তার বন্দোবস্ত থাকে না—এরূপ বন্দোবস্ত যে থাকা দরকার তাও কেউ ভাল ক'রে উপলব্ধি করেন না।) আর মেসের ত কথাই নেই। আমাদের দেশে কথা আছে—'এক উস্‌খুস্ দুয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল চারে হাট'। মেসে অনেকে একত্র জোটে, কাজেই প্রত্যেকে হাটের মধ্যে গিয়ে পড়ে। হাটে হয় হট্টগোল, সরস্বতী সেখানে টিকতে পারেন না। (মন্দিরে যেরূপ ভক্তের জপতপ আরাধনা—পাঠাগারে সেইরূপ ছাত্রের অধ্যয়ন ও সাধনা। ছাত্রের প্রধান কর্তব্য অধ্যয়ন; আর এই

অধ্যয়ন তপস্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। একাগ্রচিত্ততা এই তপস্যায় সিদ্ধিদান করে।)

প্রথম কথা এই যে—কি করে পড়তে হয়? (ক' ঘণ্টা পড় তার হিসাব রাখবার দরকার নেই, কিরূপ একাগ্রতার সহিত অধ্যয়ন কর সেইটাই সবার চেয়ে দরকারি জিনিস। পড়াশুনার উদ্দেশ্য সফল করতে হলে—ঘণ্টার উপর নয় একাগ্রতার উপর নির্ভর করতে হয়। আমি আজ সকালে "খুব" পড়েছি—কিন্তু মোটে একঘণ্টা, কি তার কিছু বেশী। এইভাবে আমি রোজই পড়ি, তা রবিবার নেই, ছুটিও নেই, অবকাশ নেই, এইভাবে সমানে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত পড়ে যেতে হবে। কিন্তু এদেশে ছাত্রদের প্রধান বিপদ গল্প খেলা আর আড্ডা। একাগ্রতার সম্পূর্ণ অভাব; তার উপর পড়বার সব সময়টা খেয়াল ও হুজুগের মধ্যে কেটে যায়। পরে যখন পরীক্ষা কাছে এগিয়ে আসে—তখন আহারনিদ্রা ত্যাগ করে, রাত্রিজাগরণে স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে তার জন্যে প্রস্তুত হবার বিপুল প্রয়াস। এ-কে লেখাপড়া বলে না, এ লেখাপড়া নয়, এ ইউনিভারসিটিকে ফাঁকি।) (কেবল মুখস্থ আর উদরস্থ; পেটুকের মিষ্টান্ন ভক্ষণের মত—এক পন সন্দেশ টপাটপ্ করে গেলা, তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বমি। সব সময়টা ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা কাছে এলেই টপাটপ্ মুখস্থ ও উদরস্থ করবার প্রয়াস; তারপর পরীক্ষা-মন্দিরে গিয়ে একেবারে বমি। পরীক্ষার পরই সরস্বতীর সঙ্গে 'সেলাম আলেকম্' —সকল সম্বন্ধ লোপ।) (আর পাশ হলে 'হকার' চাচার দোকানে পুস্তক-বিসর্জ্জন।) মনে পড়ে ছেলেবেলায় জ্বর হ'ত, আর কেবল মিছরী, বেদানা ও কুইনিন খেতে হ'ত। কালাজ্বর মনে করিয়ে দেয় ব'লে ঐ জিনিসগুলোয় আমার একটা ভয়ানক বিতৃষ্ণা আছে—ওগুলো আমার কাছে বিভীষিকা! পাশ করবার পর এদেশের ছাত্রদের পুস্তকের উপর ঐ রকমই তীব্র বিতৃষ্ণা হয়—বইগুলো তাদের কাছে আতঙ্ক উপস্থিত করে। (পুস্তককে আজীবন সঙ্গী করতে হবে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে পরীক্ষার পর বই আর পাবার জো নেই।) শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার কোন ছাত্রকে বলেছিলেন "ব্ল্যাকীর সেলফ-কালচার' বইখানা দাও ত"। সে জবাব দিলে "সে বই তালাবন্ধ, দেখলে ভয় হয়।" এ বড় দুঃখের কথা। (সৎ পুস্তককে আজীবন সহচর করতে হবে, আজীবন ধ'রে সৎপুস্তক পাঠে ভাব সংগ্রহ করতে হবে, হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখতে হবে এবং প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন করতে হবে।) ইংরেজ কবি সাদি পুস্তককে লক্ষ্য করে যথার্থই বলেছেন—

"The mighty minds of old"
"My never-failing friends are they."

(পুস্তকপাঠের উদ্দেশ্য সফল করতে হলে খুব বেশী বই পড়বার দরকার হয় না। অনেকে যা পায় তাই পড়ে, পরিণত বয়সেও তাদের এই অভ্যাস

থেকে যায়। তারা কখন পুস্তক নির্ব্বাচন ক'রে পড়ে না। ছুটি পেলে তারা অনেক রকমে অনেক পয়সা ব্যয় করবে। বেড়াবার সখ্ মেটাবার জন্যে দামী পোষাক, ট্রাঙ্ক, গ্লাড্‌স্টোন্ ব্যাগ কিনবে, কিন্তু ছুটিতে পড়বার জন্যে কি বই সঙ্গে নিয়ে যাবে কখনই তার কিছু স্থির করবে না। হাতে যা পাবে তাই পড়বে, কিছু বিচার করবে না।) বায়রণের পদ্য থেকে এমার্সন বলেন, "He knew not what to say and so he swore"। (প্রথম মনে হ'ল কি পড়ব? খবরের কাগজখানা তুলে নিলাম, আগে খবর পড়লাম, তারপর অন্য কথা পড়া হ'ল, শেষ বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ পর্য্যন্ত নিঃশেষ করা গেল। কি পাওয়া গেল, কি বোঝা গেল, তার কোন চিন্তাই করলাম না। কিন্তু এরকম ঠিক নয়, উদ্দেশ্যবিহীন পাঠ কোনমতেই ঠিক নয়। সবার আগে পড়বার উদ্দেশ্য খুব ভাল করে বুঝতে হবে, তারপর রুচি অনুসারে পুস্তক নির্বাচন করতে হবে, কারণ সকলের সব বই ভাল লাগে না। কিন্তু একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে তারই উপযোগী পুস্তক নির্বাচন করা এদেশের ছাত্রদের মধ্যে নেই বললেই চলে। যে-কোন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে যদি জিজ্ঞাসা করে দেখেন,—"পাঠকগণ নভেল নাটকই বা কত পড়েন, আর ইতিহাস ও জীবনীই বা কখানা পড়েন,"—দেখবেন তৃপ্তিকর উত্তর পাওয়া যাবে না।

আমাদের ছাত্রদের মধ্যে নভেলের প্রতি একটা ভয়ঙ্কর আগ্রহ দেখা যায়। ভাল-পাশ-করা শিক্ষিত ছেলে ছুটিতে যদি নভেল পেলে ত স্নানাহার বন্ধ—যতক্ষণ না বইখানা শেষ হয়। কিন্তু একখানা নভেল পড়তে আমার ছ'মাস লাগে, কারণ আমাকে ঠিক সময়মত কাজ করতে হয়, ল্যাবরেটরীতে কাজ করার পর আধ ঘণ্টা সময় পেলে পড়ি, নইলে নয়। সব কাজেরই একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা চাই —সকলেরই এই প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, বিশেষ আমাদের দেশে, যেখানে স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোকে আজীবন ব্যাধিগ্রস্ত, দেশে খাবার নেই, শরীরে পুষ্টি নেই। সকলেই দীন দরিদ্র, অন্নসংস্থানের ভাবনায় সবাই অস্থির। বাঙালীর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য মাছ ও দুধ সর্বত্রই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। একে অস্বাস্থ্যের এই সব কারণ উপস্থিত রয়েছে, তার উপর ছাত্রের অতিরিক্ত পাঠ; কাজেই অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং সে কাজের বা'র হ'য়ে পড়ে। ২৪ ঘণ্টায় একদিন। (ছেলেমানুষের আট ঘণ্টা ঘুমুলেই যথেষ্ট হয়। ১৬ ঘণ্টা হাতে থাকে। তার মধ্যে রোজ ৪ ঘণ্টা পড়লেই প্রচুর। কিন্তু পড়তে হবে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সহিত, নইলে কোন কাজ হবে না। বাঙ্গালী ছাত্রের প্রধান শত্রু—পড়বার সময় অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ করলে গল্প আসবেই, অন্ততঃ অতর্কিতভাবে আসবে। আর বাঙ্গালীর প্রধান বিপদ হচ্ছে আড্ডা। বেশী বয়সে আমরা সবাই বসে কাটাই, বাহিরে উঠে হেটে বেড়াতে উৎসাহ আসে না, প্রবৃত্তিও হয় না; তাসপাশাতেই কত সময় কেটে যায়।

আবার এই তাশপাশার আড্ডার পাশে অনেক সময় ছেলেরা পড়াশুনা করে। বিপদ্ কি ভয়ানক! ইউরোপীয়ান্ যখন পাঠাগারে একমনে অধ্যয়ন করে তখন তার স্ত্রীকেও ("May I come in") "আমি কি ভিতরে যেতে পারি" এই ব'লে দরজায় (Knock) টোকা দিতে হয়। যেন অনিচ্ছসত্ত্বেও ঘরে যেতে হচ্ছে— যেন শুধু বিরক্ত করতে। কারণ পাঠাগার ঠাকুরঘরের মত পবিত্র স্থান, সেখানে কথা কওয়া পাপ।)

তার পরের কথা—

"Work while you work, play while you play,
This is the way to be cheerful and gay"—

(কাজের সময় কাজ করতে হয়, খেলার সময় খেলা ; তা হ'লেই মনে আনন্দ ও উৎসাহ থাকে।) আমি সর্বাদাই কাজ করি, আবার অবসর মত করি না। একজন বড় ইংরেজ দোকানদার আপিসে এক মনে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম ক'রে কাজ করে, কিন্তু যেমনি কাজ শেষ হয় অমনি গঙ্গার ধারে, খোলা মাঠে, মুক্ত বাতাসে বেড়াতে যায়। তারা সে সময়ে বসে থাকে না, কুড়েমি করে না, আড্ডা বা মজলিসে জমে না। (কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য রাখতে জানি না, সময়ে কাজ করি না, তাই শরীর ও সময় দুই-এরই অপব্যবহার হয়, স্বাস্থ্যও থাকে না, কাজও ওঠে না।)

এদেশে শুধু বই পড়িয়ে বিদ্যা শেখানো হয়। কিন্তু ইউরোপে সাধারণ পুস্তক পাঠের সঙ্গে প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল গ্রন্থ পাঠ ক'রে জ্ঞানার্জ্জন করবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া হয়।) শুধু বই পড়ে কত শেখা যায়? নিজের চেষ্টায় বিশ্বরাজ্যের নানাপ্রকার অদ্ভুত ঘটনা নিপুণ চক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়, তবেই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন হয়। (পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় কখনই বেশি হয় না। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে মদের দোকানে গিয়ে বসে থাকতেন। উদ্দেশ্য মাতালের কথাবার্তা শুনে তার প্রকৃতি বুঝে দেখা। এইভাবে নানা রকমে বিখ্যাত ইউরোপীয়েরা মানব-প্রকৃতি নিখুঁত করে জানবার চেষ্টা করেন। এ-ই প্রকৃত অধ্যয়ন। (মানব-প্রকৃতির পর জড়-প্রকৃতি। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাও বুঝতে হবে। লণ্ডনের কাছে এক বোটানিকেল গার্ডেন আছে, তার নাম কিউ গার্ডেন্স (Kew Gardens), পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ করবার জন্যে শত সহস্র বিদ্যার্থী যেখানে যান। নানা রকমের গাছ, তাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির নিয়ম—নিজের চোখে সুকৌশল পর্য্যবেক্ষণ ক'রে উদ্ভিদ সম্বন্ধে তাঁরা অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। আর আমাদের এই সুজলা সুফলা দেশে, এই ভারতবর্ষে ত গাছের অভাব নেই। কিন্তু উদ্ভিদ সম্বন্ধে কি তত্ত্ব জানতে পেরেছি আমরা? বিলাতে তিন মাস, কি তার কিছু বেশি দিন ধ'রে গাছপালায় সবুজ পাতা থাকে। অন্য সময়ে কাচের ঘরের মধ্যে কলাগাছ প্রভৃতি বাঁচিয়ে রাখতে

হয়। কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কয় মাসের সুবিধায় উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করে সেই সম্বন্ধে নানা সত্য আবিষ্কার করে। আর আমরা এই চির সবুজ দেশে চিরকালই চুপ ক'রে বসে থাকি। চক্ষুষ্মান্ কারা? ১৮৪৫ সালে হুকার নামে এই ইউরোপীয়ান্ এ দেশে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আহরণ করতে এসেছিলেন। তখন দার্জ্জিলিঙ্গের রেল হয় নি। কিন্তু তিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে গাছগাছড়া দেখবার জন্যে সিকিম গেলেন। তারপর সে দেশে বন্দী হলেন; সেই কারণে সিকিমের সঙ্গে যুদ্ধই বেধে গেল। যা হোক্ অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি ১০,০০০ (দশ হাজার) রকম আবশ্যকীয় গাছগাছড়া সংগ্রহ ক'রে বিলাতে ফিরে গেলেন; সে-সব এখনও কিউ গার্ডেন্সে (**Kew Gardens**) আছে। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে ভারতের উদ্ভিদ-জ্ঞান ইংরেজের বই পড়ে শিখতে হয়।

রকস্‌বর্গের **Flora Indica** নামে এক অমূল্য গ্রন্থ আছে। শতাধিক বৎসর পূর্বে তিনি সমস্ত ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করে নানা রকম গাছ সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রত্যেকটির বাঙ্গালা হিন্দী তামিল নাম জোগাড় করেছিলেন। তাঁর বই সকলে পড়ে। এ'রা ইউরোপীয়ান্ ম্লেচ্ছ, কিন্তু আমাদের চিরস্মরণীয়।

জুঅলজিক্যাল গার্ডেনে ইউরোপীয়েরা নানা রকম পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির জীবন-যাপন-প্রণালী অধ্যয়ন করেন। ফরাসী দেশের একজন উকিল কুড়ি বৎসর ধ'রে শুঁয়োপোকা ও প্রজাপতি কেমন ক'রে এক থেকে অপরে পরিণত হয় তা পর্য্যবেক্ষণ করেছেন, আর তার একটি কৌতুহলপ্রদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া তিনি নিজের চোখে গুটি ও তঁত পোকার জীবনযাত্রা দেখে, ঐ সকল কীট থেকে রেশম উৎপন্ন করা সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় নূতন কথা সভ্য জগৎকে জানিয়েছেন। আর একজন অন্ধ মধুমক্ষিকার ইতিহাস লিখেছেন। তিনি যৌবনে অন্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁর স্ত্রী ও ভৃত্য মধুমক্ষিকার জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে সেই সব কথা তাঁর কাছে বলতেন এবং তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তা লিপিবদ্ধ করতেন। এই প্রকারে হিউবার (**Huber**) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক মৌমাছির ইতিবৃত্ত (**History of the Bees**) লিখেছেন।

ইংরেজ ও আমেরিকানের এক একটা **Hobby** অর্থাৎ খেয়াল আছে। কেউ গার্ডেনিং করেন, বাগানে নানা রকম ফল ফুল উৎপন্ন করেন। এ একটা সুন্দর খেয়াল। কেউ বা প্রাণীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, আবার কেউ বা পতঙ্গবিজ্ঞান (**Entomology**) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমাদের ভূতপূর্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল নিজে পতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ইংরেজ কখন ব'সে থাকে না। এই রকম একটা খেয়ালে থাকে। এই সকল ব্যাপার অধ্যয়ন ক'রে তাঁদের সকলেই যে কলেজের অধ্যাপক হন তা নয়, কিন্তু এই সব কথা

পুস্তকে প্রকাশ ক'রে তাঁরা জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন, তাঁদের বিলক্ষণ আয়ও হয়।

এদেশে গবর্মেণ্ট পুনা কৃষি-কলেজে লেফ্রয় (Lefroy) নামক একজন মস্ত পতঙ্গতত্ত্ববিৎ (entomologist) কে এনেছেন। তিনি কোন্ কোন্ পতঙ্গ শস্য নষ্ট করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আমরা জানি শুধু পঙ্গপালই ফসল নষ্ট করে দেয়; কিন্তু আরও অনেক রকম পতঙ্গ আছে যারা ফসলের বড় কম ক্ষতি করে না। ইনি তাদেরই জীবনযাত্রা আলোচনা করছেন, আর কিসে তাদের নষ্ট করে শস্য বাঁচানো যায় তার উপায় আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন। এই সকল ব্যাপারের আলোচনা ও অধ্যয়ন আমাদের ব্যবসা ও ধনাগম সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করে। যাঁরা পতঙ্গবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা কি ক'রে তুঁত-পোকাকে রোগের হাত থেকে রক্ষা ক'রে বর্দ্ধিত করতে হয়, তা জানেন। গুটি-পোকার রোগ হলে তা থেকে ভাল রেশম হয় না। ফ্রান্সে **"Disease of Silkworm"** অর্থাৎ গুটিপোকার রোগ সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সে বই পড়ে যাঁরা রেশমের চাষ করেন তাঁরা গুটিপোকাকে বর্দ্ধিত করবার নানা রকম উপায় জানতে পেরেছেন, আর সেই কারণে রেশমের চাষে খুব লাভবান্ হয়েছেন। আর আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরে—যেখানকার উৎকৃষ্ট রেশম এক সময়ে সব দেশে আদৃত হ'ত—সেখানে রেশমের চাষ দিন দিন উঠে যাচ্ছে; কারণ আমরা ঐ কাজ অজ্ঞ চাষাদের হাতে ফেলে রেখে দিয়েছি যাদের গুটিপোকা সম্বন্ধে খুব বেশি জ্ঞান নেই।

এই সমস্ত কারণেই বলছি যে, শেখবার অনেক আছে, শুধু কেতাব পড়লেই হয় না। আমি এলবার্ট স্কুলে পড়তাম্। সেখানে প্রত্যেক শনিবার কেশব সেনের বক্তৃতা হ'ত। তিনি এক সময়ে বলেছিলেন "বাঙালীর ছেলের শেখাপড়া শেখা যেন বালিসের খোলে তুলো পুরে দেওয়া; কেবল ঠাসো আর গাদো।" তার উপর অভিভাবক সর্বনাশ করছেন—(স্কুলের ছুটি হ'লেই মাষ্টার মশাইকে ছেলের পিছনে লেলিয়ে দেবেন, ছেলে বিদ্যে শিখবে। এঁরা হচ্ছেন **murderer of boys** বালকহন্তা, কারণ স্কুলের ছুটির পর ছেলের অন্তত; দুই বা আড়াই ঘণ্টা খেলা চাই। সে সময়টা খোলা মাঠে ছোটো, দৌড়াও, লাফাও, নদীতে নৌকা বাও। তবে ত স্বাস্থ্য থাকবে, মনে প্রফুল্লতা আসবে। তা নয়, বাড়ী এসেই কেতাব নিয়ে বসো।) (তারপর কোন্ ছেলে কোন্ বিষয়ে **backward** অর্থাৎ কাঁচা,—অমনি প্রাইভেট টিউটর লাগাও—ইংলিসে একটি, সংস্কৃতে একটি, সব বিষয়ে একটি একটি। টিউটরের ঠেলায় বেচারি ছাত্র একবারে **dull** অর্থাৎ গাধা হয়ে ওঠে, নিজে ভাববার বা নিজের উপর নির্ভর করবার শক্তি তার একেবারে লোপ পায়। তাই বলি, এ প্রথার অনেক দোষ।) এমার্সন বলেন **"Guardians are benefactors but sometimes they act like the worst malefactors,"**—অভিভাবকগণ ছেলের উপকার করেন বটে

কিন্তু সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর অপকার সাধন করে থাকেন। (বেশী পড়লেই বিদ্যে হয় না। আমি আজীবন ধরে সামান্য একটি বিদ্যা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পাঠ ত এক ঘণ্টা।

আমাদের বাঙালীর ছেলের জীবন যেন একটা ভার বওয়া। বেদান্ত মতে জীবন কিছুই নয়, দুহাজার বছর ধরে আমরা চিরকাল শুনে আসছি, জীবন মানে কিছু নয়—'নলিনীদলগতজলমিব'—এর একটা প্রভাব জাতীয় চরিত্রে ত আছেই। আমরা সকলেই খানিকটা স্বীকার করে নিই যে জীবন একটা দুর্ব্বহ ভার। তার উপর আবার এই ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রাম। সকাল আটটার সময় বাড়ী থেকে দৌড়াদৌড়ি করে ম্যালেরিয়াজীর্ণ শরীর খানি নিয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করা অর্থাৎ কলম পিষে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য সহরের দিকে ছুটোছুটি করা। দিন যে কোথা দিয়ে চলে যায়, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী তা জানতে পারে না—পৃথিবীর কোন আনন্দই সে উপভোগ করে না। আকাশের উন্মুক্ততা, আলোকের হাসি বা বাতাসের সুখময় স্পর্শ—কিছুই তার প্রাণে সজীবতা ও নবীনতা আনয়ন করে না। লাবকের (Lubbock) "জীবনের সুখ" নামে একখানি পুস্তক আছে। ঐ পুস্তকে তিনি বলছেন—জীবন কি শুধু ঔষধ-গেলা। জীবনে আনন্দ-উপভোগই বিধাতার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষে সেই উদ্দেশ্য বিফল করি। পাখী গায় কেন, মৌমাছি মধু আহরণ করে কেন, যদি বিধাতার সৃষ্টিতে আনন্দ না থাকে?

লাবক একজন ধনী মহাজন (**broker**) ছিলেন। অতুল তাঁর ধন ঐশ্বর্য্য, কিন্তু লেখাপড়া যথেষ্ট জানতেন। তিনি আজীবন ছাত্র (**student**)। অনেক ইউরোপীয় ধনী মৌমাছি পিঁপড়া প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আবিষ্কার করেছেন। আমরা তা বই পড়ে জানি, কিন্তু তাঁরা নিজের চোখে দেখে ঐ সব কথা লিখে গেছেন। আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ। শুধু চোখ থাকলেই হয় না, সূক্ষ্ম দর্শন চাই। ইউরোপীয়ান্ লেখক লাবক মৌমাছিদের সাধারণতন্ত্র (**Republic**) সম্বন্ধে এক চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মৌচাকে কেমন ক'রে তারা সকলে কাজ করে, সে অদ্ভূত বিবরণ পড়লে—মাতোয়ারা হ'য়ে উঠতে হয়। লর্ড এর্ভবেরী (**Sir John Lubbock**) যে শুধু ধনী ছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখক। আমাদের দেশের ধনী সাধারণতঃ জবড়জং জানোয়ার হয়। তার নাকের ডগা থেকে ওলনদড়ি ঝুলিয়ে দিলে ভুঁড়ির দরুন **perpendicular** অর্থাৎ লম্বরেখার যে বিচ্যুতি হয় তাই তাঁর ধনশালিতার মাপ। ধনী জুড়ি চড়েন, আর আয়েসে বিলাসে ডুবে থাকেন। কিন্তু ইউরোপে অনেক স্থলে এরূপ হয় না। বিলাতে মাটির তলায় রেল (**under-ground railway**) আছে। তাতে প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী নেই। লাখ্‌পতি ও সাধারণ লোক সব এক জায়গায় বসে। এণ্ড্রু কার্ণেগী একজন ক্রোড়পতি, পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহের মালিক। আমেরিকার পিট্‌স্‌বার্গে তাঁর

লোহার কারখানা ছিল। প্রথম বয়সে তিনি রাস্তায় খবরের কাগজ বেচতেন। তারপর অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে আমেরিকায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। পরে টাকা রোজগার ত্যাগ করে অধ্যয়নে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। তাঁর ব্যবসা এত বড় ছিল যে, একজনে নয়—অনেকে প'ড়ে ৯০ কোটি টাকা দিয়ে সেই ব্যবসাটি কিনেছেন ; তার বাৎসরিক আয় হচ্ছে সাড়ে চার কোটি টাকা। তিনি শ্রমজীবীদের জন্যে আমেরিকা ও স্কটলণ্ডের অনেক সহরে বিনাব্যয়ে অধিগম্য পাঠাগার স্থাপন করেছেন। মজুরগণ সন্ধ্যার পর যখন অবসর পায় তখন ঐ-সমস্ত লাইব্রেরীতে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করে আত্মোন্নতি সাধন করে। কার্ণেগী এখনও (এই বছর দুই তিন হয়) অনেক বই লিখছেন। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী পত্রিকায় তিনি শ্রমজীবীদের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। আগেই বলেছি, তাঁর আয় ছিল সাড়ে চার কোটি টাকা। আমাদের এই বাঙ্গলা বিহার ও অন্য জায়গায় সকল জমিদারের বাৎসরিক আয় জড়িয়ে সাড়ে চার কোটি নয়। এখনকার সকল জমিদারকে একদিকে আর কার্ণেগীকে একদিকে রেখে ওজন করলে টাকায় তিনিই ভারী হবেন। কিন্তু বিচিত্র কথা এই যে তিনি এখনও পড়েন। ছিলেন "ষ্ট্রীট্ বয়" রাস্তায় কাগজ বেচতেন, কেবল স্বাবলম্বনের জোরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র হয়েছেন।

(তোমরা অনেকেই ইউনিভারসিটির ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হও। সেটা ভাল ; কিন্তু আমাদের দেশের অপযশঃ। কারণ পাশের পর তোমরা নষ্টস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়াজীর্ণ, রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি। এ রকম ভাল-পাশ-করা ছেলের যাজ্জীবনম্ তন্মরণম্। ইংলণ্ডে কিন্তু তা নয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেরা খুব বেশী পড়ে না, অকাল-পক্ক হয় না, এঁচোড়ে পাকে না। ১৮৭৫ সালে ফার্ষ্ট ক্লাস পাশ করে আমরা আজীবন তার দোহাই দিয়ে থাকি, যদিও এই পাশ করার পর লেখাপড়ার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই আমাদের থাকে না। তারপর এই ফার্ষ্ট ক্লাস পাশ করাটাই বা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের যা **Academic year** তাতে ত দুবছরে দশ মাস মাত্র পড়া হয়। এই দশ মাস প'ড়ে সব বিদ্যা আয়ত্ত হ'য়ে যায় কি? আজীবন না পড়লে শেখা যায় না।) (প্রত্যেক দিন নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে, সে-সকলের খবর রাখতে হবে। ফার্ষ্ট হও আর না হও, আজীবন পড়বে, পাশ হবার পরেই কেতাবের সঙ্গে সেলাম আলেকম্ ক'রে তার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ কি ভয়ঙ্কর! কি সর্বনাশ! এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দেখ্‌লে আতঙ্কে আমার প্রাণ শিউরে ওঠে। তারা ছদ্মবেশী মূর্খ।)

এমার্সন বলেন, "কোন ছেলে **backward** অর্থাৎ পড়াশোনায় কাঁচা হ'লে তাকে তিরস্কার করবে না। সাধারণতঃ ছেলেরা সব বিষয়ে ভাল বা চৌকস হয় না। যে ছেলে সব বিষয়ে ভাল সে ত একটা **miracle**—একটা অদ্ভুত কিছু, যা ভূতলে অতুল।" এমার্সন আরও বলেন, "কোন ছেলে যদি চুরি ক'রে ক্লাশের বই ছাড়া

অন্য বই পড়ে, মাষ্টার তাকে বেত মারেন , আমি হলে পুরস্কার দিই। ছাত্র হয়ত নেপোলিয়নের জীবনী বা গোল্ডস্মিথের ইতিহাস বা যা তার স্কুলপাঠ্য নয় এমন কিছু পড়ছে ; তাতে বাধা দেওয়া অন্যায়, উৎসাহ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, কারণ সে অনেক নূতন বিষয় শিখতে পারবে। (ছাত্রের প্রতি চাপ দেওয়া উচিত নয়, তার প্রতিভার যাতে বিকাশ হয় শিক্ষকদের তাই করা চাই।) ইউনিভার্সিটির বাঁধা বই পড়লে বা গোটাকতক পাশ করলে প্রতিভার বিকাশ হয় না। হালিসহরে রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন, তাঁর কথা সবাই জান। তিনি হিসাব-লেখার এক চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু খাতার পিঠে পিঠে কালী-সংকীর্ত্তন লিখতেন। এমন কি ভারতের যে দুজন জগতে অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন,—রবীন্দ্রনাথ ও রামানুজম্ (ইনি সম্প্রতি রয়েল সোসাইটির সভ্য হয়েছেন)—তাঁদের কেউই ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের ধার ধারেন না, তাঁরা পাশ করা নন্। কিন্তু এই পাশ না করতে পারলেই আমাদের ছেলেদের মুখ আঁধার। মা বলেন, পোড়া কপাল আমার, ছেলে পাশ হলো না। আবার সময় সময় ছেলে আত্মহত্যা ক'রে বসে। আমি বলি—তোমার যা ভাল লাগে তাই কর। উৎসাহের সহিত একটা নূতন কিছু আরম্ভ করে দাও। কারণ উকীল ডাক্তার ও কেরাণী এই নিয়ে জাতি টেঁকে না। আমাদের চরম দুর্গতি হয়েছে। এখন আমাদের নানা বিষয়ে, অর্থকর বিষয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিতে হবে। এ সম্বন্ধে আমি আমার লিখিত "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" নামক পুস্তিকায় কয়েকটা কথা লিখেছি ; তোমরা সেটা পড়ে দেখো। আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, বিধাতা যেন বলেন, "বাঙ্গালীর ছেলে, শরীর নষ্ট করবি আর কেরাণীগিরি করবি ; তার বেশী কিছুই নয়।" এ অবস্থায় থাকলে চলবে না, এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ ; এ পথ থেকে ফিরতেই হবে।*

---

* বক্তৃতাটি 'প্রবাসী' ১৩২৫, আষাঢ় সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় এই বক্তৃতা দেন।

৩

চীনে ছাত্র আন্দোলন

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আমি চীন ও ভারতের চিন্তাধারা ও সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে প্রয়াস পাচ্ছি। এই উভয় দেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু পূর্বেকার স্মৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন নিয়ে আমাদের চিন্তার দুয়ারে আঘাত করে। এই উভয় দেশের পৌরাণিকতা বৎসরে, যুগে অথবা শতাব্দীতে নয়—এদের পৌরাণিকত্ব শত সহস্র বৎসরের—যা আমরা সহজে অনুমান, অথবা বিশ্বাস করতে রাজী নই। কেউ কেউ বলে থাকেন এদের পৌরাণিকতার পরিমাণ ৪ হাজার বৎসরের বেশী।

আমি বহু সহানুভূতিশীল ও দরদী গ্রন্থকার—যারা চীনকে ভাল ক'রে জানেন—তাঁদের অনেক বই পড়েছি। তাঁরা চীনের খাঁটি চিত্র এঁকেছেন। চীনের জাগরণ তাঁদের লেখায় জীবনী শক্তি নিয়ে আমাদের সম্মুখে ফুটে উঠেছে।

প্রথম বিষয়—যা' ইউরোপকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে, তা' হলো—চীনের প্রাচীনত্ব যে সভ্যতাকে সে তিন হাজার বছর পূর্বেও জিইয়ে রেখেছিল। ইহাই জগতের একমাত্র সাম্রাজ্য, যেখানে জাতিভেদ বা সমাজভেদ নেই। এখানকার লোক বিয়ের জন্য কুলীন-অকুলীন, গোত্র-গোষ্ঠী বিচার নিয়ে হট্টগোল বাধায় না ; এখানকার আন্তর্জাতিক বিবাহ বাস্তবিকই একটা ভাববার বিষয়। এই প্রকার উদারতায় ইসলাম অনেক অগ্রসর।

ত্রিবাঙ্কুর এবং তৎপরে বরোদার দেওয়ান দেশবিখ্যাত রাজনৈতিক স্যার মাধব রাও চীনের বিষয়ে বলতে গিয়ে বক্তৃতার কোন স্থলে বলেছিলেন—"আমাদের দেশের শতকরা আশি জন দেশবাসী যেভাবে সর্ব্বদিক দিয়ে লাঞ্ছনা ভোগ করছে, তা আমাদেরই নিজেদের সৃষ্টি করা লাঞ্ছনা। এই দুর্দ্দশা দূর করতে হ'লে আমাদেরই করতে হবে। বাকী শতকরা বিশজন দেশবাসী যে কষ্ট ক'রে জীবন-যাপন করছে—সে কষ্টের বোঝা আমরা বিদেশী শাসনকর্তার কাঁধে চাপাতে পারি; কিন্তু এর প্রতিকারও আমাদেরই হাতে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই চীনের প্রকৃত জীবন জাগরণের সূত্রপাত হয়। কালের মহালীলায় তাদের স্বাধীনতা ও সভ্যতার সেই আলোকশিখা নিভে গিয়েছিল। তাই

আবার যুগ-ভেরীর মহানিনাদে তাকে চীনের জলে স্থলে জ্বালবার জন্য তার মহাপ্রাণ নাড়া দিয়ে উঠল। জাপান আপনাকে শক্তিশালী ও সমুদয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মনে ক'রে চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন্দল পাকাতে সুরু করলে। জাপান তখন নববলে বলীয়ান। নূতন শক্তির শিহরণ তার প্রতি শিরায় শিরায় অনুভব করতে লাগল। জড়তার মোহ কাটিয়ে কেবল সে টাট্‌কা জীবনের আস্বাদ গ্রহণ আরম্ভ করেছে—এমন সময় চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষা ক'রে নিজেকে যাচাই করতে তার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগলো। চীনের অবস্থা তখন মুমূর্ষু। থাকবার মধ্যে ছিল তার মান্ধাতার আমলের কতকগুলি সংস্কার, আর 'অচল ফ্যাসান'। এতে চীন জাপানের কাছে একটা বড় রকমের ধাক্কা পেল। জাপান ইচ্ছামত কামান দাগিয়ে চীনকে নাস্তানাবুদ করলে এবং কয়টি বন্দর ও পোতাশ্রয় দখল করে নিলে। চীনের সীমারেখা আস্তে আস্তে কমতে লাগল। অবশেষে সে ফর্ম্মোজা দ্বীপটি পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

লি-হাংচু অন্তর-আঁখি দিয়ে ভবিষ্যতের যে দৃশ্য দর্শন করলেন—তাতে তিনি স্বতঃই ভাবলেন যে, যদ্দিন না চীন আপনার জড়তার খোলসকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রাচ্যের নবীন ভাবধারা ও কর্ম্মনীতিকে গ্রহণ করবে—তদ্দিন চীনের এই বেদনার আঘাত থেকে মুক্তি নেই। এর পর থেকেই চীনের রাষ্ট্রজীবনের পরিবর্ত্তনের সুরু হলো।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চীনের কর্ম্মধারা এমনি ক'রে বদলে গেল এবং চীন আপনাকে এমনি করেই কাজে লাগিয়ে দিলো যে, জগৎ বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে তার ঐ পরিবর্ত্তনের ও কর্ম্মের ফল দেখতে লাগলো।

চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ যেমনি এশিয়া এবং ইউরোপের অনেকটা অংশকে এশিয়ার করতলভুক্ত ক'রে দিয়েছিল—তেমনি পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীগণকে এশিয়াকে আক্রমণের দ্বারা ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নেবার জল্পনা করতে লাগলেন। জার্ম্মানী থেকে বিসমার্ক বলতে লাগলেন—এশিয়ার অর্দ্ধেক পড়বে ইংলণ্ডের ভাগে, আর অর্দ্ধেক পড়বে রুশিয়ার ভাগে; এমনি ক'রে এশিয়া ভাগ-বাটোয়ারা হ'য়ে ইউরোপের পেটে তলিয়ে যাবে। তখনই ভাল করে গোলমাল বেধে উঠল।

তার পরেই এলো আসল কথা—চীনের যুব-আন্দোলন—যাকে দিয়ে চীন আপনার নিজস্ব সভ্যতাকে ফিরিয়ে পেয়েছে। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর চীনের তরুণ তাপসগণ আপনার মধ্যে বিশেষ করে জীবনের শিহরণ অনুভব করতে লাগল। তারা তাদের দেশকে ভাল করে দেখলো। দেখলো তাদের জননী জন্মভূমি তাদের দিকে করুণ ও ম্লান আঁখি নিয়ে চেয়ে রয়েছেন। দেশের পরাজয় ও দুর্নামের প্রতিকারকল্পে তাদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে তারা প্রতিজ্ঞা করে বসল, এবং যে জাপান তাদের এমন আঘাত দিয়েছে, সে জাপানের বুকে বসে তাদের মন্ত্র নিতে

প্রস্তুত হলো—এক নয়, দুই নয়, বিশ হাজার তরুণ বীর জ্ঞান সাধনার জন্য জাপানের রাজধানী টোকিও নগর একেবারে জুড়েই বসলো। তাদের উদ্দেশ্য জাপানের শিক্ষা, জাপানের কর্ম্মধারা চীনের প্রতি সহরে, প্রতি পল্লীতে, এবং প্রতি গৃহে আমদানী করা।

চীনের এ-জ্ঞানসাধনার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে জাপান রোধ করতে সাহস করল না। বরং তার আপন দেশে চীনা ছাত্রের জন্য বহু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করলো। চীনের জয়যাত্রা সুরু হলো—তরুণরা মনপ্রাণ দিয়ে জাপানে পড়তে লাগল। তাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করলো। মনের মত লোক হয়ে তারা দেশে ফিরল। ফিরে আমাদের দেশের বিলাত ফেরতের ন্যায় সাধারণ সমাজের সহিত বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করলো না। তাদের ঐ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মূলে আমাদের দেশের গোলামীর গোলক-ধাঁধায় পড়বার প্রবৃত্তি ছিল না—ছিল এতে দেশসেবার এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার এক বিরাট কামনা।

দেশের বন্ধন মোচন করাই তাদের "জীবন-বিসর্জ্জনের" কারণ হওয়ায় তারা জ্ঞান-সাধনার পরবর্ত্তী জীবনে দেশের কাজে আপনাদের জীবনকে নিয়োজিত করলে। দেশে ফিরে তারা চীনকে এই বাণী শুনালে জাপান যাহা পারবে, পেরেছে—চীনও তাহাই পারবে এবং পারাই তার চাই। এ-নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে দেশের কাজে তারা নামলো—নামবারই মত ক'রে।

তাদের এ-সব ঝোঁক দেখে, জীবনদানের এ-সব মহাদর্শ দর্শন করে জগদ্বাসী চমৎকৃত হলো—বাস্তবিকই বুঝি চীনের "দিন" ফিরলো।

এই যে জাপান-ফেরৎ তরুণ তাপসগণ চীনের কলঙ্ক দূর করবার মানসে দেশে বেরুলো—তারা ত আর সরকারী সাহায্য পাবার আশায় ব'সে রইল না। তাদের নিজের খাবার পরবার তারা নিজেরাই যোগাবার বন্দোবস্ত করে নিল। যাকে বলি আমরা 'মনোহারী' জিনিস তা নিয়ে তারা দেশে বেরুলো। এ সব তারা দেশকে খেলনা করে-উপহার দিতে বেরুলো না। এ-সব বেচে তারা খোরাক যোগাবার বন্দোবস্ত করলে—আর দেশের অশিক্ষিত অন্ধদের শিক্ষা ও আলো দেবার যোগাড়-যন্ত্র করলে। সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, তারা নৈশবিদ্যালয়, অবৈতনিক বিদ্যালয়—সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয়ের পত্তন করে, দেশের লোককে ডেকে ডেকে টেনে চোখ-ফোটাতে লাগল। এ-সব যে তারা নিজের পড়া শিকেয় তুলে করছিল তা নয়, এ-সব কাজ তারা অবসর মতই করছিল। গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটিতে এ-সব কাজ তারা এমনি করে করে যেতো যে—কলেজে ফিরে গিয়ে এ-সবের কথা খপ করেই ভুলে যেত না—এবং যেতো না বলেই তাদের স্থাপিত এ-সব বিদ্যালয় ও পরিশ্রম মারা যেত না।

এই অবৈতনিক স্কুলের দ্বারা অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার দরিদ্র ছাত্র চীনের নানা শহরে শিক্ষালাভ করে মানুষ হ'তে সুযোগ পেয়েছিল। প্রত্যেক মন্দির বিদ্যালয়ে

পরিণত হলো ; এতে শিক্ষার সাধনা বেশী রকমে সহজ হয়ে পড়লো। পূজার হোমশিখার সঙ্গে জ্ঞানের হোমশিখা সমান জ্বলে উঠলো।

চীনের ছাত্রদের যদি কলকাতার ছাত্রদের সাথে তুলনা ক'রে গড়-পড়তা মিলিয়ে দেখা যায় তা হ'লে আমরা কি দেখতে পাই ? অন্ততঃ কমপক্ষে তের হাজার ছাত্র যারা কলকাতার ইউনিভার্সিটিকে জুড়ে আছে, তারা যদি চীনা ছাত্রদের ন্যায় মাত্র অবসরটুকু দেশের শিক্ষার জন্য ব্যয় করে, তাহ'লে তারাও কি চীনাদের মত কাজ ক'রে যেতে পারে না ? তারাও কি অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার ছেলেকেও মানুষ করতে পারে না ? না হয় স্কুলের কথা ছেড়েই দিলাম। ঢাকায় ১১টি হাইস্কুলের ৪৪ শত ছাত্র, আর ইউনিভার্সিটির ১২ শত ছাত্র অন্ততঃপক্ষে চার হাজার ছেলেকেও মানুষ করতে পারে না ?—করলে অবশ্যই পারে না !

আমাদের যারা ম্যাট্রিকুলেশন দিয়ে সুদীর্ঘ চারটি মাস ঘুমিয়ে কাটায়, যারা আই-এ, বি. এ., দিয়ে প্রায় তিন মাস খেলিয়ে বেড়িয়ে কাটায়, অথবা যারা সাধারণভাবে দীর্ঘ গ্রীষ্মের বন্ধে তাস পিটে, ঘুম দিয়ে, হাই তুলে, গল্প-গুজব ক'রে উড়িয়ে দেয়, তারা যদি এদিকে একটু নেকনজর দেয়, তাহ'লে কি দেশের একটা বিরাট সমস্যার কিঞ্চিৎও সমাধান হ'তে পারে না ?

আমাদের দেশের ভাষা, চীনের ভাষা থেকে অনেকই সহজ। সে ভাষায় তাদের দেশবাসীকেও কথা কহিতে শিখতে হয়। এমনি যে জড়ানো ভাষা এও তারা সহজ করে নিয়েছে—আপনাদের পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাধনা দ্বারা। আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষাকে চীনা ভাষার সহিত তুলনা করা যেতে পারে। এই ভাষাকে পরিবর্দ্ধিত করতে, আরো সহজ আকার ও প্রকার দিতে চীনা ছাত্ররা প্রচার করছে, এমন কি বই লিখেও বিলি করছে।

চীনে ধর্ম্মভেদ নাই—সেখানে বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রীষ্টান সবাই 'চীনা'। তাদের দেশের নামেই সব চলে যায়। চীনবাসী বাস্তবিক পক্ষেই দার্শনিক গোছের লোক। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম্ম নিয়ে থাকবে, অথচ অবাধ মেলামেশায় আপত্তিজনক কিছু নেই। সপ্তম শতাব্দীতে কনফুসিয়স তাদের যে বাণী দিয়ে গেছেন—তারা আজও সে বাণী ভোলে নি। সে বাণী অনুসরণ করে তারা এখনও চীনা, এখনও কর্ম্মী, এখনও দেশসেবক সবই হচ্ছে। তবু আসলে তারা চীনাই থাকবে। আমাদের মত আগাগোড়া অনুকরণের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় নি।

চীনাদের সর্ব্বসমাজেই আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের প্রচলন বাস্তবিকই একটি বিস্ময়ের জিনিস। ধর্ম্মবিশ্বাসের অনৈক্যের জন্য ইনকুইজিশান অথবা অন্যান্য প্রকার পাশবিক অত্যাচার সে দেশে নাই—ইহা ভাববার বিষয় বটে। সেণ্ট বার্থালমকে মেরে কেমন করেই না তারা ধর্ম্মের গোড়ামি দেখিয়েছিল। স্পেনের ইনকুইজিশনের ব্যাপারখানাও সবার জানা আছে। এই তো ছিল পুরাতনের প্রতি লোকের একটা অন্ধানুরাগ—একটা যুগযুগসঞ্চিত সংস্কার।

চৌকিওতে গিয়েই তারা জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাকে থামিয়ে রাখেনি। অধ্যবসায়শীল কৃতী ছাত্রদের দু'হাজার গেল ফ্রান্সে—আর এক হাজার গেল বিলাতে। তারা আমাদের দেশভুক্ত বিলাত ফেরতের মতন কেবল ফ্যাসান নিয়ে ফিরতে সুদূর প্রবাসে যায় নি, তারা গেছিলো—দেশের বন্ধন খুলতে যা কিছু দরকার তা সঞ্চয় করে, সংগ্রহ করে আনতে। স্বদেশে ফিরে তারা গোলামীর জিঞ্জির গলায় পরেনি। তারা চেয়েছিলো—চীনাবাসীকে নিয়ে এক মহাজাতি গড়ে তুলতে, চেয়েছিলো চীনকে মানুষ করতে।

স্যার অতুল চ্যাটার্জী ও পরাঞ্জপে আফসোসের সহিত বলেছিলেন যে, ভারতবাসী কেন বেশী সংখ্যায় বিলেতে শিক্ষালাভ করতে যায় না? কিন্তু আমি বলি—বিলেত গিয়ে লাভ কি এদের? তারা তো বিলেতী ফ্যাসানের আমদানী ছাড়া আর বেশী কিছু আমদানী করবে না? তবে কিনা ডঃ ঘোষ, আর মেঘনাদ সাহার ন্যায় ছেলেদের অবশ্যই যে বিলেত যাবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। ভারতবাসী ছাত্রেরা যেরূপ কচি বয়সে বিলেত যায় - তাতে মনের সেই তারুণ্য নিয়ে—এইরূপ ফ্যাসন শেখার তোতাপাখী হয়ে ফেরা কোন তাজ্জবের বিষয় নয়।

আমি একটিও বিলেত ফেরৎ আই. সি. এস. কে দেখছিনে—যিনি ক'বছরের মধ্যে বেশ নাম করে ফিরেছেন, আর দেশে এসে কিছু করছেন। কেবল ব্যারিষ্টার—ব্যারিষ্টার। 'বার' একেবারে ঠেসে গিয়েছে, এক কণা কোথাও স্থান নেই। যেন পিঁপড়েরই দল আর কি? আমি যদি দিনেকের জন্যও Dictator হতুম, তা'হলে দেখতে—এ-সব ফৌজদারী আদালতকে একেবারে মাটির সমান করে মুছে দিতুম—একবারে পালিশ। দেখ না, আলীপুরের মত স্থানেও ৮ শত উকিল। বছর বছর আরো ২০/২৫ জন করে বাড়ছেও। ১০-১৫ বছর বাদে কি হবে, তাই আমি ভাবছি।—দেশ যেন উকীলময় হয়ে যাবে—মক্কেল যেন আর মক্কেল থাকবে না।

এই যে বিগত ১৯০৬ সালে চৌকিয়োতে পনেরো শ' ছাত্র শিক্ষালাভ করছিলো তাদের সংখ্যা কত বেড়েছিলো জান? তারা বাড়তে বাড়তে একেবারে পঞ্চাশ হাজারে পরিণত হয়েছিলো; কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা! কিন্তু আরও তাজ্জবের কথা কি জানো? তারা যে কেবল সংখ্যাতেই বেড়েছিল তাই নয়—তারা আরো এমন কিছুতে বেড়েছিল যা শুনলে তোমরা অবাকই হবে। এসব ছাত্রের অর্দ্ধেকই আপনার খোরাক আপনারা জোগাতো; বাপ-দাদার কাঁধে ভর দিয়ে তারা চলতে চায় নি। আমাদের দেশের বিলেত প্রবাসীদের মা-বাপ তো মাসে মাসে চার পাঁচশো করে টাকা পাঠিয়েও ভাবনা চিন্তায় দিন কাটান। চৌদ্দ হতে চল্লিশের মাঝামাঝি ছিল তাদের বয়স। ২৫ হলেই যে বুড়ো হলো, এদের এই অপবাদ ছিলো না।

এ-সব বলা তো অনেকটা হলো—চীনের ছাত্রের উদ্যম ও উৎসাহ সম্বন্ধে তোমরা অনেক কিছুই জানলে। এখন আমি তোমাদের বলতে চাই, তোমরা কি এ-সব সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখবে না? চীনাদের যারা বিদেশ থেকে বিদ্যে শিখে আসে, তাদের বলা হয় **Returned Student,** যেমন আমরা বলি "বিলেত ফেরত"। চীনা বিলাত-ফেরত আর ভারতবাসী বিলাত ফেরৎ সম্বন্ধে কি তোমরা ভাবতে চেষ্টা করবে?

পিকিন, ক্যাণ্টন, হংকং এ-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দশ হাজার ছাত্র বিদ্যা শিখে জ্ঞান সঞ্চয় করতো—তা সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মিঃ হর্নেলের কথায় বেশ বোঝা যায়। তারা বাহির থেকে ভেতরে এসে, দেশের ভেতরকেও গড়ে তুলেছিল। এই ছিল এদের ত্যাগ ও প্রয়াসের বৈচিত্র্য।

চীনের লোকসংখ্যা হলো ৪০৫০ লক্ষ। এদের ভেতরে নিজের জীবনপাত করে জাগরণ আনয়ন করা এত সহজ নয়। তবু ছাত্রদের চেষ্টায় ছাত্রদের অধ্যবসায়ে তারা কত যে জাগবার এবং বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলো তা তোমাদের কত ক'রে বলবো?

চীনের ছাত্ররাই দেশের লোককে দেশের কথা বুঝাবার জন্য চার শ' কাগজ চালাত। দেশের লোক এতে কি পেতো জান? তার মনের সত্যিকার বাণী—সত্যিকার ডাক পেতো। দেখ তো আমাদের দেশের ছাত্রদের অবস্থা—একটিও কি কাগজ আছে যা দিয়ে তারা আপনাদের মনকে লোকের কাছে প্রকাশ করে?

আমাদের দেশে তথাকথিত ভদ্রলোকদের কথা ত্যাগ করে মধ্যবিত্তদের কথা ধরলে দেখা যায়—এদের অনেকটা চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আর সাধারণ সমাজের কথা ত এখানে আসতেই পারে না। ছেলেদের খরচ দিন দিন যে ভাবে বাড়ছে তাতে মধ্যবিত্ত লোকেদেরও যে আর কদিন ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে তা মনে হয় না? চীনে সবাই সবার কথা ভাবে, একে অন্যের সাথে মিলে। পণ্ডিত মূর্খের সাথে মেশে; কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যে—মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বিদ্বান জানে, কি করে অশিক্ষিতদের কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে চলবে এবং কি করে এদের ঘৃণা করতে হয়। এখানেই সব গলদ।

প্রেসিডেন্সি, ইসলামিয়া, রাজসাহী, কটক ইত্যাদি সরকারী কলেজগুলোতে ছাত্রদের মাথা পিছু সরকার এবং দেশ যা খরচ করছে—তা যে ছাত্রদের দ্বারা আবার ফিরে পকেটে আসবে তেমন আশা করাই বৃথা। যত প্রকার উন্নতির কাজ চীন দেশে চালানো হয়, সবই মধ্যবিত্তদের দ্বারাই সাধিত হয়। কিন্তু বাংলার মধ্যবিত্তগণ—সে সব বিষয়ে একেবারে পণ্ডিত;—পরিশ্রমের কাজ এঁরা একেবারে গোলায় তুলে রেখেছেন—যেন গোলারই ধান।

বাংলার জেলাসমূহে ধান, পাট ইত্যাদি ফসল জন্মে। ফরিদপুরে সব চাইতে

প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ধান, পাটে প্রায় বিক্রয় ১২ কোটি টাকা। আর লোক হলো ২২ লাখ, মাথা পিছু আয় দাঁড়ায় ৫২ টাকা করে। এই আয় কি যথেষ্ট? আর এই আয় কি বাঙালী রাখতে পারে? বাংলার কৃষক সমাজের অবস্থা কি যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। এই যে প্রজাদের চৌষট্টি হাজার খাওয়া হয়, তার পরিবর্তে দেওয়া হয় কি, তার কি কোন হিসেব আছে? হিসেব আমরা কোন দিকেই বা করি? আজ হিসেবের দিন এসেছে—হিসেব করে আমাদের বাঁচতে হবে—এর জন্য অনেকের মরতেও হবে। এই বিপুল দায়িত্ব নেবার জন্য যদি কেহ প্রস্তুত হয় তবে জেনো এরা তরুণ—এরা ছাত্র—এরাই বিধাতার বরপুত্র।

ব্যবসা ও বাণিজ্য, আষাঢ়, ১৩৪২ থেকে সংগৃহীত।

৪

পাঠাগারের ব্যবহার

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

লাইব্রেরীর সম্বন্ধে কিছু বলতে হ'লে প্রথমেই বলতে হয় যে, বই সংগ্রহ করা ভাল বটে, কিন্তু আসল জিনিষ হচ্ছে পড়া। আগেকার দিনে পড়িয়া আর পড়াইয়া পণ্ডিতেরা জ্ঞানের বিস্তার করতেন। কিন্তু তখন অনেক অসুবিধা ছিল। আজকাল আর লেখাপড়া শেখবার জন্য, জ্ঞান অর্জ্জন করবার জন্য, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার আবশ্যকতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না হ'লে কিছু হবে না, একথা বলা চলে না। বিশ্ববিদ্যলেয়ের ডিগ্রী, ডিগ্রীধারীর অজ্ঞানতা ঢেকে রাখবার আবরণ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেই একমাত্র লাইব্রেরীর উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা ঘরে বসেই যথেষ্ট জ্ঞানসঞ্চয় করা যেতে পারে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একমাত্র কাজ যেন গ্রাজুয়েট তৈরী করা। কিন্তু আমাদের দেশে বহুলোক ছিলেন এবং এখনও আছেন, প্রতিভায় উজ্জ্বল— তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল না। যেমন কেশব চন্দ্র সেন, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি। মেকলে বিলেত থেকে ভারতবর্ষে আসবার পথে জাহাজে বিস্তর বই পড়ে ফেলতেন। তখনও সুয়েজ খালের পথে ভারতে আসবার রাস্তা হয় নি। বিলেত থেকে ভারতে আসতে হত 'কেপ-অব্-গুড-হোপ' ঘুরে। তাতে বহু সময় লাগত। এই দীর্ঘ সময়ে জাহাজেই তাঁর হাজার হাজার বই পড়া হয়ে যেত। গিবন্ অক্সফোর্ড গিয়েই ফিরে এসেছিলেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর মত জ্ঞানী কয়জন? তিনি অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে লাইব্রেরীতে বসে জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন। সেই জ্ঞানের ফল পৃথিবীতে দিয়ে গিয়েছেন—'রোমক সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস'—এক অতি অপূর্ব্ব জিনিষ। বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী জনসন্ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। দুবেলা তাঁহার আহার জুটতনা। একদিন তিনি তাহার পুস্তক প্রকাশকের কাছে কিন্তু টাকা ধার চেয়ে এক পত্র লিখেছিলেন, নীচে সই করেছিলেন—'খাদ্যহীন'। এই জনসন লাইব্রেরীতে প'ড়ে প'ড়ে জ্ঞানবান হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার তাঁর সঙ্গতি ছিল না। মহাপণ্ডিত কার্লাইয়ের বাড়ী ছিল স্কটল্যাণ্ডে। তাঁর পিতা রাজ-মিস্ত্রীর কাজ করতেন। অতি দরিদ্র ছিলেন এঁরা। কার্লাইল বল্‌তেন—'রক্ষে যে আমি জমিদারের ছেলে হয়ে

জন্মাইনি, তাই মানুষ হয়েছি'। তাঁর পিতা তখন তাঁকে এডিনবরার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। সেখানে এসে তিনি বল্লেন—'একমাত্র গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছাড়া এখানে আর মানুষ কেহ নাই।' তবুও যে তিনি এডিনবরায় রইলেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে, এডিনবরায় খুব ভাল একটি লাইব্রেরী ছিল। তিনি সেই লাইব্রেরীতে বসে নিজের চেষ্টায় ইটালিয়ান, কেল্ট ও জার্মাণ ভাষা শিখেছিলেন। ভারতবর্ষে যে কয়জন মহা মহা দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, কেউই বিদেশে গিয়ে জ্ঞান অর্জন করে পণ্ডিত হননি। এঁদের কারও নামের পিছনে ক্যান্টাব অক্সন নেই। এঁরা ভারতে থেকেই লেখাপড়া করে পণ্ডিত হয়েছেন। অনেক জাপানী লণ্ডনে যায়, বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ করে আনতে। তাঁদের কাউকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি লণ্ডনের ডাক্তার (**Doctor**) উপাধি নিতে এসেছ? তবে সে চটে যাবে। সে তৎক্ষণাৎ জবাব দেবে, কেন আমাদের দেশের **Doctorate** কি কিছু নয় যে, আমরা বিদেশের উপাধির জন্য লালায়িত হব? আমরা যে বিদেশী ডিগ্রীর জন্য ব্যস্ত হই, সেটাও আমাদের দাস মনোভাবের ফল। আসল জিনিস হচ্ছে জ্ঞানস্পৃহা। পড়াশুনা করতে চাইলে আমাদের যে সব লাইব্রেরী আছে তাতেও যথেষ্ট বই পাওয়া যায়। কলিকাতার **Imperial Library** ও **University Library** থেকে আমি বছরে অন্ততঃ এক হাজার বই নিয়ে পড়ি। পড়ি, নোট করি, যেন রাত পোহালে আমার এম, এ, এগজামিন। দেশে যে সব লাইব্রেরী আছে তারও সদ্ব্যবহার দেশের লোক করে না। সারবান বই খুব কম লোকই পড়ে।

আমাদের দেশে শিক্ষালাভের আর একটি প্রকাণ্ড বাধা এই যে, আগে ইংরেজী ভাষা শিখে তারপর অন্য সব শিক্ষা করতে হয়। ইংরেজী শিখিতে কি সময় নষ্ট! কি পরিশ্রম! কোন ইংরেজকে যদি বলা হয় যে, তোমাকে জার্মাণ শিখে তারপর সেই ভাষার মারফৎ অপর যা কিছু শিখতে হবে, তবে সে ঐ কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে ভাববে। অথচ এই বিষম অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশে চলে আসছে। বাংলা ভাষায় সব শেখা যায়।

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে দু'ঘণ্টা করে পড়লে বছরে একটা সাধারণ লাইব্রেরীর সমস্ত বই পড়ে শেষ করা যায়। নিজের চেষ্টাতেই লোকে জ্ঞানবান হতে পারে, পরের আর সাহায্য আবশ্যক হয় না।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, মানুষের সঙ্গী দেখিলেই তাকে চেনা যায়। আমি বলি, মানুষ কি বই পড়ে তা দেখলেই তাকে চেনা যায়। আসল কথা হচ্ছে পড়া দরকার। যাকে বলে "**well-informed**", তাই হওয়া দরকার। '**well-informed**' না হ'তে পারলে লেখাপড়া শেখার কোন সার্থকতা নেই। *

* 'মাধবী'—মেদিনীপুর, চৈত্র, ১৩৩৬।

৫

পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

এমার্সন বলেন "গোলাপবাগান কার? —আমার; আমার দেখে সুখ, চোখের তৃপ্তি, হৃদয়ের আনন্দ! বাগানের মালিক বেড়া বাঁধান, মালি রাখেন, জলসেচন করান; সে অনেক কাণ্ড। কিন্তু অমন শোভা কার'ও একার নয়।" কারণ গোলাপের সার্থকতা ফুটে, সৌন্দর্য্যের বিকাশ ক'রে। আর সে সৌন্দর্য্য দর্শক্ মাত্রেই উপভোগ করতে পারেন। কথাটি পাঠাগার সম্বন্ধেও সত্য। পাঠাগারের যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা পয়সার যোগাড় কর্‌বেন, জমি কিন্‌বেন, ঘর তুলবেন; তারপর উৎকৃষ্ট পুস্তকারাশি সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণের হাতের কাছে এনে দেবেন। সে পুস্তকের অধিকার কা'রও একার নয়। পাঠক মাত্রেই তার সৌন্দর্য্যরস উপভোগ করতে পারবেন। এই গ্রন্থশালা জ্ঞানলিপ্সুদের বড় আদরের জিনিস।

জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকিব। (আমি আজীবন ছাত্রভাবে আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চ'লে গেছে বুঝতে পারি নি। আজ বার্দ্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি।) (আমি দিনের মধ্যে দু ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দি,—দিন সার্থক হয়।) (জগতে যা কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত আছে)। উপনিষদ্ ও ষড়্‌দর্শনের তত্ত্ব, গ্রীসদেশের সক্রেটীস্, প্লেটো, অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি মহানুভবগণের চিন্তারাশি, এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যে মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের বাণী,—সকলই পুস্তকের মধ্যে। তাঁরা যা দিয়ে গেছেন তা অমূল্য সামগ্রী। আমরা সকলেই উত্তরাধিকার-সূত্রে তার অধিকারী। যিনি ধনী তিনি স্ত্রীপরিবারকে সুখে রাখেন, তাঁর ব্যক্তিগত রোজগার ছেলে, নাতি, বড় জোর আত্মীয়স্বজনে খায়। তিনি গহনা গড়ান, কোম্পানীর কাগজ করেন, জমিদারী কেনেন, আর পাটা কবুলত লেখেন। তাঁর জিনিস ঘরের বাইরে যায় না। কিন্তু ভাব ও চিন্তাজগতের কথা স্বতন্ত্র। প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভাব-সমুদ্র মন্থন ক'রে যে রত্ন আহরণ করেন তা'তে সকলের সমান অধিকার। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সকলের সাধারণ সম্পত্তি। তাই গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিকগণ মহামান্য, জগতকে তাঁরা মহাঋণপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখে যান।

এদেশে লাইব্রেরীর উন্মেষমাত্র হচ্ছে। (আমাদের মুস্কিল এই যে পাঠ্য-

পুস্তক ছাড়া আর কিছু বড় কেউ পড়তে চায় না। তাই বলি, আমাদের কপাল পুড়ে গেছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সূচনা থেকে ছাত্রগণের একমাত্র চিন্তা হ'য়ে উঠেছে—কি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উপাধি নেব।) তারপর উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার, কেরাণী—এ ছাড়িয়ে যাবার আর যোগ্যতা নেই; কেবল দাসত্ব আর গতানুগতিকে গা ঢালা। স্বাধীন জীবিকা ব'লে যে একটা কথা আছে শিক্ষিতদের সে ধারণা নেই।) পোষ্ট অফিসের ছাপের মত তাঁরা ইউনিভার্সিটির ছাপটাকেই সার বুঝেছেন। যা হোক এখন সুবাতাস বয়েছে, সময় এসেছে। তাই ধীরে ধীরে পাঠাগারের আদর বাড়ছে।

আমেরিকার ৪৮টি ষ্টেট্ আছে। প্রত্যেক ষ্টেটে একটি বা কোনটিতে দুটি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়, তা ছাড়া আবার প্রাইভেট্ ইউনিভার্সিটিও আছে। জাপানেও তাই,—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। জ্ঞানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে ব'লেই তারা নিজের দেশে দরিদ্র জনসাধারণের হিতার্থে জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছে। বাতাস, জল যেমন বিনা মাশুলে মেলে, ঐ সব দেশে তেমনি সৎ পুস্তকরাশিও দরিদ্রের অনায়াসলভ্য সম্পত্তি হচ্ছে। সকলেই তা বিনা মাশুলে পাচ্ছে, তার জন্যে ব্যয় করতে হচ্ছে না। সেখানে ধনীরা বলেন—দারিদ্রের গৃহে শিক্ষার পথ পরিষ্কারের সূচনামাত্র এখানে হয়েছে; লাইব্রেরী এই সূচনার প্রধান লক্ষণ। ঐ সব দেশে জ্ঞানপিপাসা অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু আমাদের জ্ঞানপিপাসা এখনও হয় নি। পরীক্ষা-পাশ আমাদের বরাবর সন্ধান ছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট ক্লাস (**First Class**) এম-এ পাশ করেও কেউ রিসার্চের (**Research**) দিকে ঘেঁসে না। কারণ তাতে বিপুল উদ্যম ও ধৈর্য্য চাই, দিনের পর দিন একটানা খাটুনি চাই। কিন্তু সে উৎসাহ কোথায়? তাই বলি প্রায় কোনো গভীর চিন্তা-প্রসূত ফল হয় নি এই লেখাপড়ায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়, পৃথিবীর সামনে দাখিল করা যায় এমন কিছু অল্পই আছে।

আপনারা কার্ণেগীর নাম শুনেছেন। তিনি স্কটলণ্ডের লোক। ছেলেবেলায় খবরের কাগজ বিলি করতেন। তারপর নিজের উদ্যমের বলে আমেরিকার পিট্‌স্‌বার্গের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লোহার কারখানার মালিক হয়েছিলেন। ৯০ কোটি টাকা দিয়ে একজন নয়—একদল লোক মিলে তাঁর কারখানা কিন্‌লে। তিনি টাকা নিয়ে স্কট্‌লণ্ডে ফিরে এলেন। তাঁর আয় বছরে ৪ কোটি টাকা হবে, অর্থাৎ সমগ্র বাংলা দেশ থেকে গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব হিসাবে যত টাকা পান প্রায় তাই। দেশে ফিরে এসে তিনি গ্লাস্‌গো, ডণ্ডী প্রভৃতি বড় বড় সহরে **Workingmen's Institute** অর্থাৎ শ্রমজীবীদের জন্যে বড় বড় বিদ্যামন্দির ও গ্রন্থশালা খুলে দিলেন। সমস্ত দিন কলকারখানায় খেটে সন্ধ্যার পর তারা এইসব গ্রন্থাগারে নানা রকমের বই, খবরের কাগজ প্রভৃতি পাঠ করে। সেখানে তারা চা, কাফি খায়—

মদ নয় ; ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় মদের বিষময় ফল ফলে। শ্রমজীবীদের
পাঠাগারের জন্যে কার্নেগী অনেক বড় সহরে সাত লক্ষ করে টাকা দিয়েছেন।
ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে এ রকম পাঠাগার স্থাপিত হ'তে আরম্ভ
হয়েছে। সে সব দেশে মুটে, মজুর, গাড়োয়ান কাগজ পড়ছে, রাজনীতি আলোচনা
ক'রছে। যারা মাটির নীচে খনিতে কাজ করে তারাও কাগজ পড়ে। চাকরাণী,
মেথরাণীও দেশের খবর রাখে। জাপানেও তাই। (রবিবাবু বল্লেন—জাপানে
তাঁর বাসার দাসী তাঁর গীতাঞ্জলির খবর রাখে।) দেখুন এই সব জায়গায়
জ্ঞানস্পৃহা কত বলবতী। আর আমাদের দেশের দিকে চেয়ে দেখুন। (যে
বই কেনে সে পড়ে না, আর যার পড়বার ইচ্ছে আছে তার কেন্‌বার পয়সা জোটে
না। তারপর বই চেয়ে নিয়ে গিয়ে ফেরত দেয় না—ওজর দেখায় অমুক নিয়ে
গেছে। এই রকমে দিন কতক কাটিয়ে দিয়ে শেষে বইখানার অস্তিত্ব বিলোপ
ক'রে দেয়। এই রকম জঘন্য আচরণে লাইব্রেরী উজাড় হ'য়ে গেছে শুনেছি।)
(বাঙ্গালী গয়না গড়াবে, চাঁদনীতে নানা ফ্যাসনের কাপড় কিন্‌বে, নানা
রকমের বিলাসে পয়সা নষ্ট করবে, কিন্তু পুস্তকে নয়।) মান্দ্রাজে দেশীয়
লোকের খুব বড় পুস্তকের দোকান আছে। উদাহরণস্বরূপ - গণেশ কোম্পানী ও
নটেশন্ কোম্পানীর নাম করা যেতে পারে। নটেশন্ মোটর চড়েন। প্রথম দেখে
মনে হয়েছিল বই-এর দোকান ক'রে মোটর হাঁকাচ্ছেন অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তির
অপচয় করছেন। কিন্তু তা নয়—এর পিছনে মান্দ্রাজীদের জ্ঞানের আদর ও
পাঠের তৃষ্ণা বর্ত্তমান। তাই তিনি নিজের রোজগারেই মোটর কিনেছেন।
আমাদের বাংলাদেশে **Text book,** ছাত্রপাঠ্য বই না ছাপালে দোকান উঠে যায়।
কিন্তু নটেশন্ **Text book** বা ছাত্রপাঠ্য বই ছাপান না। তাঁরা বাংলা তথা
ভারতবর্ষের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের বক্তৃতা ছাপান ; রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্বি-
গণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি নানা প্রকারের পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই
কাজে ব্যবসায়ী যে শুধু লাভবান্ হন তা নয়, সৎপুস্তক প্রকাশ ক'রে দেশের একটা
অভাবও দূর করেন। তাই বলতে হয় সেখানে জ্ঞানতৃষ্ণা বেশি। কলকাতার বড়
পুস্তক-বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা যায় **"People's Library"** প্রভৃতি
সংস্করণের অল্প মূল্যের বই মান্দ্রাজীরা বেশী কেনেন, বাঘালী বড় একটা কেনেন না।
বাংলাদেশে টেক্সট্ বুক কমিটির অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক না হ'লে আর বই উদ্ধারের
উপায় নেই। এখানে রসায়ন-সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পুস্তকের আদর হয় না। কারণ তার
জন্যে "ল্যাবরেটারী" চাই। ছেলেদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলে জীবজন্তু সম্বন্ধে
কৌতূহল হ'তে পারে, এই ভেবে একখানা ছোট 'প্রাণীবিজ্ঞান' লিখেছিলাম। কিন্তু
বইখানা কয়েক বৎসর পড়ে রইলো, কাটতি হলো না। কিছুকাল পরে, জানি
না কেন, সেখানা 'টেক্সট্ বুক কমিটি'র (**Text Book Committee**) অনু-
মোদিত হ'য়ে গেল। একজন ইন্‌স্পেক্টার পূর্ব্ব বাংলার একটা অঞ্চলের জন্য

সেখানা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন ; ব্যস, এক নিশ্বাসে সব বই বিক্রী হ'য়ে গেল।

বিজ্ঞান-কলেজের জন্য স্যর্ তারকনাথ ও স্যর্ রাসবিহারী পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। দুটি ল্যাবরেটারীর প্রত্যেকটিতে ২০ জন ছাত্রের জন্য বছরে ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হয়, অর্থাৎ মাথাপিছু ২৫০০ টাকার উপর ব্যয় হচ্ছে। তবু কি ব্যাপার ! প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী কজন পাই ? অনেক সময় কাঁদ্তে হয়। এখন ক্রমশঃ হাওয়া ফির্ছে। তবে কোকিল একবার ডাক্লেই যে বসন্ত সমাগম হয়, এমন ভাব্‌লে চলে না। সে বসন্তের অগ্রদূত মাত্র। লণ্ডন, প্যারী প্রভৃতি স্থানের **Chemical Journal**-এ অর্থাৎ রসায়নসম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রিকায় প্রত্যেক বারে বর্ণমালা অনুসারে হাজার দু-হাজার রাসায়নিকের নাম থাকে। তার অন্ততঃ ৫০০ জন রসায়ন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। জার্ম্মানীতে ৫০০০, ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় কয়েক হাজার, এবং সমস্ত য়ুরোপে অন্ততঃ ১০,০০০ রাসায়নিক প্রতিদিন মৌলিক গবেষণা করেন। আর আমরা ? এই কবির কথায় বিংশতি কোটি—এখন ত্রিশ কোটি মানুষ, আমরা কি কর্‌ছি ? আমাদের গর্ব্বের কিছু নেই। আমায় সভাপতি হবার জন্যে টানাটানি করেন ; আজ সমাজ সংস্কারের আলোচনা, কাল পাটেল বিল ; কিন্তু এক মুর্গী কবার জবাই হয় ? **ত্রিশ** কোটির মধ্যে অন্ততঃ ত্রিশজন রাসায়নিক (**Chemist**) হোক, তবে ত নিষ্কৃতি ; নইলে বিশ্রাম কোথায় ?

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লণ্ডনে পাঠাগারের প্রচলন দেখে অবাক হয়েছিলেন—

"আমি গিয়া দেখিলাম শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের মনে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ ঐ শ্রেণীর মানুষের মনে জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্য চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক রাজপথে দুই-দশখানি বাড়ীর পরেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সেখানে নামমাত্র কিছু পয়সা জমা দিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া, সে পুস্তক আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকানঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবসা করিতেছে, সেই সঙ্গে একপাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতেছে ! ইহা ভিন্ন স্বল্পমূল্যের বিক্রেয় ব্যবহৃত পুস্তকের দোকান অগণ্য। এইরূপ একটি পুস্তকালয়-বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা মনে রহিয়াছে। আমি দোকানে অন্য কাজে গিয়া দেখি, একপার্শ্বে দুইটি আলমারীতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। মনে করিলাম পুস্তকগুলি স্বল্প মূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক ; জিজ্ঞাসা করিলাম—এ সব পুস্তক কি বিক্রয়ের জন্য ?

উত্তর—না, এটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরী।

আমি—এ সব পুস্তক কাহারা লয় ?

উত্তর—এই পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা।

আমি—আমি কি বই লইতে পারি ?

উত্তর—হাঁ পারেন, এ ত সাধারণের জন্য।

তারপর আমি একখানি ৬।৭ টাকা দামের বই লইয়া দুই আনা পয়সা জমা দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া দিয়া আসিলাম। আবার সপ্তাহান্তে বই ফেরৎ দিয়া আবার দুই আনা দিয়া আর একখানি বই লইয়া আসিলাম। এইরূপ তিন চারি সপ্তাহের পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ ব্যবসা তোমরা কতদিন চালাইতেছ ?'

উত্তর—গত ৮।৯ বৎসর।

আমি—মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না ?

উত্তর—কিরূপে ?

আমি—লণ্ডনের মত বড় সহরে মানুষ এক পাড়া হইতে আর এক পাড়ায় উঠিয়া গেলে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। মনে কর, যদি বই ফিরাইয়া না দিয়া এ পাড়া হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে বই কি করিয়া পাইবে ?

এই প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহারা বলিল, 'তাহা কি করিয়া হইতে পারে ? এ যে আমাদের বই ? উঠিয়া যাইবার সময় ফিরাইয়া দিতেই হইবে।'

আমি—মনে কর যদি না দেয়।

তাহারা হাসিয়া কহিল, 'সে হইতেই পারে না।' বই না দিয়া যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে—ইহা যেন তাহাদের ধারণাই হয় না।"

—"আত্মচরিত," পৃঃ ৩৫৬।

(আপনারা হাজারখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী করুন, মাসিক চাঁদা দু আনা। দেখবেন মাসে মাসে অনেক বই ফাঁক হ'য়ে যাবে।)

(জগতে দেখা যায়, যাঁরা বিদ্যাভ্যাস প্রকৃতই করেছেন, তাঁরা অনেকেই **Self-taught** অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় শিখেছেন।) ডাক্তার জন্সনের মত বিদ্বান্ বিরল। তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু তাঁর পিতার পুস্তকের দোকান ছিল। তিনি পাঠাগার থেকে কোনো বই নিতেন আর একটি উচ্চস্থানে ব'সে একমনে পড়তেন। এইরূপ চেষ্টায় তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন। নব্য বাংলার অভ্যুদয়ের প্রধান উৎস রাজা রামমোহন রায় রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডিগ্‌বি সাহেবের নিকট ইংরেজী পড়তে আরম্ভ করেন, আরবী পারসী শিক্ষার অনেক পরে। কিন্তু অল্প দিনে এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে ইংরেজী-নবীশরা অবাক্। দেশে কাশী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অনেক টোল ছিল। তাই সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ক'রে তিনি একখানা চিঠি লেখেন। বিশপ্ হিবার সেই চিঠি তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে দেন। সে চিঠির ইংরেজী রচনা

এত উৎকৃষ্ট হয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর সেটি যখন প্রকাশিত হয়,—এশিয়াবাসীর লিখিত ব'লে তার উল্লেখ করে বিশপ্ হিবার বলেছিলেন "**Real curiosity**—অর্থাৎ, বিস্ময়ের বস্তু।" তাই বলি যাঁরা প্রতিভাশালী, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন না—নিজের শিক্ষার ভার তাঁরা নিজের উপরেই রাখেন। যদি বল **Dr. Ray. D. Sc.,** তবে বুঝতে হবে এই যে তাঁর ১৮৮৫ বা ৮৭ সালের ডিগ্রীর কথা হচ্ছে। তারপর ৩৫ বৎসর ধ'রে তিনি রসায়ন বা অন্য কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে যে গবেষণা করলেন, **D. Sc.,** বললে সেটা ত স্বীকার করা হয় না! সুতরাং (ডিগ্রীটা কিছু নয়,—ওটা অনেক সময় অজ্ঞতার আবরণ মাত্র।) অনেকে অমুক সালে দর্শন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়ে 'সুবর্ণ পদক পেয়েছি' ব'লে গর্ব করেন; এদিকে হয়ত পরীক্ষার পর পড়া ছেড়েছেন ব'লে হ্যামিল্টন ও রীডের মত ছাড়া নূতন দার্শনিক তত্ত্বের খোঁজ রাখেন না। অনেক ডাক্তারবাবু ১৮৭২ সালের অর্জিত জ্ঞান অনুসারে রোগীর প্রেস্ক্রিপ্‌শন্ লেখেন। সে কালের মতের খণ্ডন হয়ে কত নূতন মত প্রচলিত হয়েছে তার খবরই রাখেন না। আলোচনা না করলে অজ্ঞতা এইরূপই দাঁড়ায়। কিন্তু ইংলণ্ড আমেরিকায় লোকে এত ডিগ্রী চায় না। তারা চায় প্রকৃত শিক্ষা।

আমাদের দেশে একে ত লাইব্রেরীর অভাব, তারপর লাইব্রেরী যেখানে আছে সেখানে পাঠকের অভাব। সাময়িক পত্রে এখন চুট্‌কি গল্পই বেশী। এতে পাঠকের রুচি বিকৃত হয়ে যায়। তাঁরা আর কঠিন ভাবপূর্ণ বিষয় পড়তে পারেন না, ঐ চানাচুর, সাড়ে আঠার ভাজাতেই মস্‌গুল্ হয়ে থাকেন। কিন্তু চাই ভাল জিনিস। উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুশীলন করতে লোকের যাতে প্রবৃত্তি ও রুচি জন্মে—তারই বন্দোবস্ত করবার জন্যে আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। লাইব্রেরীর যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, এই কার্য্যের ভার তাঁদেরই উপর বিশেষভাবে ন্যস্ত রয়েছে। (আমার ধারণা পাঠাগারে নভেল যত কম থাকে ততই ভাল।) উপন্যাস পাঠের সার্থকতা আছে, এ কথা আমি কখনও অস্বীকার করি না। স্কট্, ডিকেন্স্, অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকগণের উপন্যাসে অনেক বিচিত্র চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের মধ্যে ভাবুকতা ও রসগ্রাহিতার অত্যন্ত অভাব। তাঁরা উপন্যাস পাঠের গল্পাংশের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতে পারেন না। আর সেই কারণেই গভীর ভাবাত্মক কোন বিষয় তাঁদের ভাল লাগে না। (লাইব্রেরীতে নানা বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক থাকা চাই; যেমন মহাপুরুষগণের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, ভূগোল, ইতিহাস, ভাবুক লেখকগণের সমাজ, শিক্ষা, নীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, কাব্যগ্রন্থ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় পুস্তক। আর থাকা চাই সারগর্ভ প্রবন্ধে পূর্ণ সাময়িক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়ে এই যে আজকালকার সাময়িক পত্রিকাগুলি নিতান্ত মামুলি ধরণের হয়ে দাঁড়িয়েছে।) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বা অক্ষয়কুমারের "তত্ত্ববোধিনী" অথবা বঙ্কিমের "বঙ্গ দর্শনের" মত সাময়িক পত্রিকা আর ত

দেখি না। নূতনের মধ্যে এই মাসের "প্রবাসী"তে "মেঘদূতের পক্ষিতত্ত্ব" নামক উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা থেকে লোকে **aeroplane** বা উড়োজাহাজের ও **arctic exploration** বা মেরু-সন্ধানের খবরও পায়। আর দুঃখ এই, আমাদের বিদ্যালয়েও কেউ ভাল করে এর খোঁজ নেয় না।

"ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ" কথাটা আমি প্রায়ই বলে থাকি। আমার দাঁত পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে কথাটা আমি বুঝতে পারি শুধু খাবার সময়, উৎসাহের সময় কখনও নয়। যুবকেরা আমার সঙ্গে কাজে পাল্লা দিতে পারে না। আমি ৯টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত ল্যাবরেটরীতে খাটি। আমি তাদের সমকক্ষ, জুড়িদার। কিন্তু মুস্কিল ত এইখানে। যাঁরা অন্বেষণের জন্য ১০০ টাকা বৃত্তি পাচ্ছেন—এদেশে এক-শ' অর্থাৎ ইংলণ্ডে পাঁচ-শ'—প্রথম বয়সে নবীন উৎসাহে তাঁদের ত আরও বেশী পরিশ্রম করা উচিত। আর যে ছাত্রদের প্রত্যেকের জন্যে সায়ান্স কলেজে বার্ষিক দু'হাজার টাকার বেশী ব্যয় করা হয় তাঁরাই বা কি করেন? বিশেষভাবে বিজ্ঞান অনুশীলন করবার উৎসাহ ও যোগ্যতা অনেকের মধ্যে ত দেখতে পাই না: দুই একটির মধ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

(কিন্তু যাঁরা বিশেষ অনুশীলনে ব্যস্ত, অর্থাৎ যাঁরা বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন, তাঁদের দেখে সময় সময় আমার ভয় হয়। ঘোড়া যেমন চলে, তাঁরা নিজের বুদ্ধিটাকে ঠিক তেমনি একরোখে চালান, দুনিয়ায় আর কোনো দিকে চেয়ে দেখেন না।) চর্ম্মকারের কাছে যেমন **Nothing like leather** অর্থাৎ দুনিয়ায় চামড়াই সার বস্তু, ময়রার কাছে যেমন ঘি আর চিনি, বিশেষজ্ঞের নিকট তেমনি তার **Special subject**, বিশেষ বিষয়টি—**Vibration of the violin string**, বেহালার তাঁতের অনুরণন বা অন্য কিছু। (সভায় সায়ান্স কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ডঃ রমন উপস্থিত ছিলেন।) আমার এক ছাত্র আছেন; তাঁর খ্যাতি য়ুরোপে পৌঁছেচে। তিনি একজন এই রকম বিশেষজ্ঞ, একজন **D. Sc.**। (একদিন ছাত্র পরিবেষ্টিত হয়ে ব'সে তাঁকে বল্লাম, "আমার ত বয়স হ'ল। **B. C. P. W.** অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিক্যাল আমার মেয়ে, আর ছাত্রেরা আমার ছেলে। এখন বুড়া বয়সে দেখছি আমার **King Lear**, রাজা লীয়ারের দশা হবে। কেউ কর্ডেলিয়া হবেন, কেউ গণেরিল, আবার কেউ বা রেগান।" ছাত্র ত শুনে অবাক্—বলেন, 'তারা কে?' দুনিয়ার সব রসে বঞ্চিত হয়ে এ রকম রসায়ন-রসিক হওয়া ত বড় মুস্কিল।) আর বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্য বড় কম দায়ী নয়। কুক্ষণে ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্য তালিকা থেকে ভূগোল নির্ব্বাসিত হয়েছে। পরীক্ষার কাজে লাগবে না,—সুতরাং আমাদের দুলালরা আর ভূগোল পড়বেন না, কে যেন মাথার দিব্যি দিয়েছে। ম্যাপ (**Map**) টাঙ্গান রয়েছে; পাশ-করা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বার্লিন কোথায়?' সে ইংলণ্ডের দিকে চেয়ে রইল। (আমার একজন সহাধ্যাপক

তিনি M. Sc. তে Figure of the Earth অর্থাৎ পৃথিবীর আকৃতি বিষয়ে গণিতশাস্ত্রমূলক বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন ভূগোলে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তারা পৃথিবীর আকার নির্দ্ধারণ করতে এসেছে, কিন্তু ভূতলের উপরে কি কি প্রসিদ্ধ দেশ, নগর বা সমুদ্র আছে সে বিষয়ে তাদের কোনও ধারণাই নেই। তারপর কন্‌সৃষ্ট্যাণ্টিনোপল্ দেখাতে বলায় ম্যাপের উপর অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াতে লাগলো। ইংলণ্ডে কিন্তু এমন হয় না। সেখানে ছেলেরা ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল আগে শেখে; পর্বত, হ্রদ, নদী, নগর, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতির কথা জানবার জন্যে তাদের আগ্রহ খুব। আমাদের দেশে পালে পালে পাশ হয়, কিন্তু কেউ কোনো খবরই রাখে না।)

বিলাতে যারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তাদের মধ্যে শতকরা ১০/১৫ জন কলেজে যায়, কিন্তু এখানে শতকরা ৯৯ জন। কলেজে পড়তে না পেলে তারা ভাবে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। আরে পাশ করলেই মাটি? কেবল কতকগুলো অকেজো পুতুল সৃষ্টি! শিবপুর কলেজ থেকে একজন এম. এস্-সি বা বি. এস্-সি 'অনার্স' এর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে, মাসিক বেতন ৫০্ টাকা। দেখুন কি ব্যাপার দাঁড়িয়েছে! বড় ষ্টেশনে রেলের মুটে মাসে ৫০্ টাকা রোজগার করে। যশোর জেলার শ্রমজীবী গ্রীষ্মকালে পোস্তা থেকে আম কিনে 'গোপালভোগ', 'ক্ষীর ভোগ' নাম দিয়ে দিনের বেলা বেচে। আর রাত্রে বেচে বরফ। এতে তারা একজন গ্রাজুয়েটের চেয়ে বেশী রোজগার করে। এ বিষয় আর কত বলবো! এখন অর্থাগমের নূতন পথ খুলতে হবে, শুধু পাশ করলে চলবে না। বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রথম যিনি ৭৫্ টাকা পেতেন, এখন তিনি ১০০০্ পাচ্ছেন। গত বৎসর কারখানার কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর রাসায়নিককে পরিচালকগণ যথেষ্ট টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। 'Knowledge is power', 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'—শুধু মুখে বললে কি চলে? বিদ্যার জোরে ইউরোপ এত করলে; আমরা কি পাশ করা ছাড়া কিছুই করতে পারি না? লেখাপড়া শিখে আমরা কি কেরাণী ছাড়া কিছুই হ'তে পারি না? যদি এমনি ক'রে শিক্ষার অপব্যবহার করতে থাকি তবে আমাদের দুর্গতির শেষ কোথায়? কলকাতার যত লোকসংখ্যা তার প্রায় অর্দ্ধেক অ-বাঙালী (Non-Bengalee)—অর্থাৎ শুধু ইউরোপীয় নয়—মাড়োয়ারী—ভাটিয়া—দিল্লীওয়ালা—হিন্দুস্থানী—ওড়িয়া—চীনে প্রভৃতি লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। (ব্যবসা বল—বাণিজ্য বল—যত রকম অর্থাগমের প্রকৃষ্ট উপায় সমস্তই বিদেশীর হাতে সঁপে দিয়ে আমরা অদৃষ্টের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে হাত পা গুটিয়ে ব'সে আছি—আর শিক্ষিত এই ভান ক'রে উপবাসে ক্লিষ্ট দেহে দিন কাটাচ্ছি।)

* বক্তৃতাটি 'প্রবাসী' ১৩২৬, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতার উপকণ্ঠ কস্‌বা (বালিগঞ্জ) লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসবে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন।

৬

সময়ের সদ্ব্যবহার

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আজ সন্ধ্যার সময় আপনাদের সুমুখে কিছু বলতে দাঁড়িয়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে কবি **Cowper**-এর সর্বজনবিদিত ছোট কবিতাটি—**"Time and Tide wait for none"** প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "রহস্য সন্দর্ভ" নামক পত্রিকায় এই সুন্দর সারগর্ভ কবিতাটির একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—

নদী আর কালগতি একই সমান,
অস্থির প্রভাবে করে উভয়ে প্রয়াণ।
* * * *
সর্ব অংশে এক রূপ যদিও উভয়,
চিন্তারত চিত্তে কিন্তু ভেদজ্ঞান হয় ;
বিফলে না বহে নদী—যথা নদীভরা
নানাশস্য শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা।
কিন্তু কাল সদাত্মক্ষেত্রের শোভাকর,
উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।

বাস্তবিক উপেক্ষিত হলে কালও মানুষকে ভয়ানক উপেক্ষা করে, তার জীবনকে ঘোর মরুভূমির ব্যর্থতায় ডুবিয়ে দেয়। আমাদের মহিলা-কবিও লিখেছেন—

একে একে একে হায়, দিনগুলি চলে যায়,
কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায়,
আর দিন চলে যায়।

মানুষের জীবনে যে-সময় একবার চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। কথাটি অতি প্রাচীন কিন্তু ততোধিক মূল্যবান। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—মানবজাতির প্রতি বিধাতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান কি? আমি তখনই উত্তর দিয়ে থাকি—মহামূল্য সময়। সময়ের সদ্ব্যয় বা অপব্যয়ের উপরই মানব-জীবনের

সার্থকতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। **Lord Morley** তাঁর **Study of Literature** নামক পুস্তকে সময়ের কিরূপ সদ্ব্যবহার করা যায় সে কথা বলেছেন। ইংলণ্ডে সামান্য কেরাণী ও শ্রমজীবিগণ পর্য্যন্ত সময়ের মূল্য বোঝেন, এক মিনিটও হেলায় নষ্ট করেন না। কিন্তু (আমরা কাজ না করার কৈফিয়ৎ দিই—সময়ের অভাব, অথচ গল্প-গুজব আড্ডা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই। বাস্তবিকই বড় লজ্জার কথা।) যাঁরা কেরাণী, সকালবেলা আহারাদি ক'রেই যাঁদের উদরান্নের জন্য দৌড়াতে হয়, তাঁরাও প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করে পাঠ করলে ৩৬৫ দিনে অনেক বই প'ড়ে শেষ করতে পারেন। কিন্তু পড়তে হবে নিয়মিত রূপে, অর্থাৎ প্রতিদিন কর্ত্তব্যবোধে সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রে। ধারাবাহিকরূপে কাজ করা চাই। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে পাথরও ক্ষয় হয়। অধ্যয়ন আমার কাছে সাধনার মত—ধ্যান-ধারণার সমতুল্য। ঠাকুর-ঘরে যখন কেউ উপাসনা-নিরত থাকেন, তখন পাছে ধ্যান ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কেউ তাঁকে বাধা দিতে চাই না। সেইরূপ কেউ অধ্যয়ন বা চিন্তা-নিরত থাকলে, তাঁকে কোনমতে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়। বাধা দিলে কত ক্ষতি হতে পারে আমরা তার ধারণাই করতে পারি না। একটা উদাহরণ দিই—কবি কোলরিজের (**Coleridge**) **Kubla Khan or Vision in a Dream** নামক বিখ্যাত কবিতা রচনার কথা। শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ কবির একটু মরফিয়া সেবন অভ্যাস ছিল। একদিন মরফিয়া সেবন ক'রে আরাম-কেদারায় তিনঘণ্টা যাপনের পর নিদ্রাবস্থায় কবির মনন শক্তি ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠল, (মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এ কথা স্বীকার করেন)—তিনি স্বপ্নে "কুবলা খাঁ" কবিতার ৩০০।৪০০ ছত্র রচনা করলেন। নিদ্রার পূর্ব্বে তিনি চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র কুবলা খাঁ সম্বন্ধে কিছু পড়ছিলেন বটে। যাহোক নিদ্রাভঙ্গের পরই কাগজ কলম দোয়াত নিয়ে কবিতাটি লিখতে আরম্ভ করলেন। ৫০ লাইন লিখেছেন এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে কোন লোক তাঁকে কথাবর্ত্তায় এক ঘণ্টা ব্যস্ত রেখে দিল। বড়ই পরিতাপের বিষয়, এই প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কবির চিন্তাধারার সূত্র হারিয়ে গেল, আর তার ফলে সেই অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা মাত্র ৫০ লাইন লিখিত হ'য়ে অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে নিভৃত নিবাসে 'গীতাঞ্জলি' রচনা করতেন তখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করলে কি অবস্থা হ'ত! সুদূর য়ুরোপ থেকে দর্শনাকাঙ্ক্ষী এসে তাঁকে কার্ড পাঠিয়ে সাক্ষাৎ করে—অন্যথা পাছে তাঁর কল্পনার স্বচ্ছন্দগতি বাধা প্রাপ্ত হয়। এ দেশে এই সব কথা বলবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে। কেহ প্রাতঃকালে আপন ঘরে অধ্যয়নানিরত আছেন, এমন সময় কোন শিক্ষিত লোক—সম্ভবত বন্ধু এসে হাজির,—বললেন "মশায় পড়ছেন নাকি?" আর মশায়, বই খুলে বসে পড়ছি না ত পায়খানায় গেছি না কি? চেয়ার টেনে বসে আরম্ভ করলেন—'খবর কি? ছেলেপুলে কেমন? মেয়ে সেয়ানা হচ্ছে, বিবাহের কি করছেন?" ব্যস্,

পড়াশুনোর ইতি হয়ে গেল। অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হল। বাস্তবিকই আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই—"উপেক্ষায় রেখে যায় মন্বু ঘোরতর।" ইংরেজ কিন্তু সময়ের মূল্য বোঝেন ; তাঁরা বোঝেন "Work while you work. play while vou Play"—(কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা। এর ব্যতিক্রম হ'লেই আমরা কোন কাজে অগ্রসর হতে পারি না।) বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত এমার্সন বলেন—"At times the whole world seems to be in conspiracy to importune you with emphatic trifles. Friend, child sickness, fear, want, charity, all knock at once at thy closet door and say—Come out unto us." অধ্যয়ন ও মননের সময় পরিচিতগণের প্রত্যেকেই একবার দরজায় ধাক্কা দেবে। তাই আরও বিরক্ত হয়ে আর একস্থানে তিনি বলছেন—'O father, O mother, O wife, O brother, O friend, I have lived with you after appearances hitherto. Henceforward I am .the truth's. Be it known unto you that henceforward I obey no law less than the eternal law ; I will have no covenants but proximities. I shall endeavour to nourish my parents, to support my family, to be the chaste husband of one wife,—but these relations I must fill after a new and unprecedented way.' সবই হ'তে রাজী আছি, কিন্তু দয়া করে আমাকে একা থাকতে দিন। বাস্তবিক এই মহামনীষিগণ গভীর চিন্তার ফলে যে ভাবরত্ন আহরণ করেন, কাব্যে অথবা প্রবন্ধে গেঁথে দেবার সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাঁদের চিন্তাধারা বিপর্য্যস্ত করে দিলে যে কি সমূহ ক্ষতি হয় সে বোধ অনেক লোকেরই একেবারে নেই।

ইংরেজ দার্শনিক কার্‌লাইল্স ছিলেন এমার্সনের বন্ধু। তাঁর জীবন-কাহিনী এক অদ্ভুত ব্যাপার। কার্‌লাইল দরিদ্র কৃষক-সন্তান। তাঁর পিতা রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। পরে বৃদ্ধবয়সে কিছু অনুর্বর জমি সংগ্রহ করে চাষ করতেন। আর্থিক অবস্থা একেবারে অসচ্ছল। বৃদ্ধ পিতামাতা—৬/৭টি ভাইভগ্নী, অজস্র প্রাণপাত ক'রে কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ হ'ত। ছেলেদের মধ্যে কার্‌লাইল ছিলেন মেধাবী ; তাই সকলে মিলে চেষ্টা ক'রে তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। সেখানে কিছু দিন একনিষ্ঠ অধ্যয়নের পর কার্‌লাইল দেখলেন এক প্রফেসর লেস্‌লি ছাড়া আর এমন কেউ নেই যার পদতলে বসে তিনি শিক্ষালাভ করতে পারেন। তাই বিরক্ত হ'য়ে কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু এডিনবরা সহর থেকে দূরে গেলেন না। পয়সা অভাবে নিকটে ডামফ্রিসশায়ারে এক ক্ষুদ্র কৃষক-কুটীরে বাস ক'রে সঙ্গতিপন্ন প্রতিবেশীর নিকট থেকে বই ধার ক'রে অধ্যয়ন-তৃষ্ণা মেটাতে লাগলেন। কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণী

থেকে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত ক্লাসে ক্লাসে দৌড়াদৌড়ি নেই,—শুধু নীরব সাধনার বলে, নিজ চেষ্টায়, সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রে কার্‌লাইল অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁর জীবন-চরিত-লেখক বলেছেন—

'Then was, perhaps, no one of his age in Scotland or England who knew so much and had seen so little. He had read enormously—history, poetry, philosophy; the whole range of modern literature—French, German, and English—was more familiar to him, perhaps, than to any man living of his own age.'

জার্ম্মান সাহিত্য ও দর্শনে কার্‌লাইল কি অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তৎপ্রণীত Sartor Resartus পাঠে তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চরিত-লেখক Henry Froude বলেছেন—তাঁর মত সাহিত্য-জ্ঞান কদাচিৎ কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। বাংলা দেশে যেমন লোকে বিদ্যার প্রসারের জন্য গ্রাম থেকে কলকাতায় যায়, কার্‌লাইল সেইরূপ প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণের জন্য লণ্ডন যাত্রা করলেন। সেখানে এক বন্ধু-পরিবারে অতিথি হ'লেন। কিন্তু দুদিন পরেই বন্ধুকে বললেন "বন্ধু এখানে চলবে না—লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে, বিশেষতঃ মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে এত সময়ক্ষেপ ক'রে আমার চলবে না। শীঘ্র একটা বাসা ঠিক ক'রে দাও, আমি বাড়ী ছেড়ে বাঁচি। কি ভয়ঙ্কর! গুডমর্নিং, কেমন আছেন, খাসা দিনটা আজকের, চা আর একটু ঢাল্‌ব কি? এই সব ভদ্রয়ানার মার-প্যাঁচের জ্বালায় যে দিনরাত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম; এখন এমন জায়গায় নিয়ে চল যেখানে কেউ বিরক্ত ক'রবে না।" এইরূপে চিত্তবিক্ষেপের সকল কারণ হ'তে দূরে থেকে, সময়ের সমুচিত সদ্ব্যবহার ক'রে কার্‌লাইল শুধু ইংরেজী নয়, জার্ম্মান, ফরাসী ইটালিয়ান, স্প্যানিস্ প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িকগণের মধ্যে তাঁর তুল্য প্রগাঢ় পণ্ডিত কেহ ছিলেন বলে আমার জানা নেই।

একজন ইংরেজ যখন পাঠাগারে অবস্থান করে, তখন সেথায় কেউ প্রবেশ করে না। এমন কি স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বামীর ঘরে দরজায় আঘাত দিয়ে—"আমি আসতে পারি কি?"—অনুমতি নিয়ে তবে ঘরে প্রবেশ করে এবং এক কি দেড় মিনিটে দরকারী কাজ শেষ ক'রে মাপ চে'য়ে পালায়। আর আমাদের অবস্থা কি? সেই ত কথায় আছে—একে—দুয়ে—তিনে হট্টগোল। পামারষ্টোন (Palmerstone) বলেন "Dirt is matter in the wrong place" বাস্তবিক সব জিনিসেরই একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান কাল আছে, যেখান থেকে ভ্রষ্ট হলে তার আর শোভা থাকে না। বৈঠকখানায় বসবার সময় কেউ রান্নাঘরে যায় না; সেইরূপ (গল্পেরও একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে এবং থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের ছাত্রাবাসে ছাত্রেরা কি

করেন ?—"ওহে ভাই শুনেছ ? কাউন্সিলে কে গেল ? কে কত ভোট পেলে ? কার কত পাওয়া উচিত ছিল ?" এইসব আলোচনা ও উত্তেজনায় ব্যস্ সময় কাবার। এক খবরের কাগজেই একটা সকাল কেটে গেল। তা ছাড়া ফুটবল খেলা প্রভৃতির আলোচনা নিয়ে আরও কত সময়ের অপব্যয় হয়, কে তার হিসাব রাখে ?) খবরের কাগজ প'ড়ো না এ কথা কখনও বলি না। আমি নিজে অনেক খবরের কাগজ পড়ি—আমার মত খবরের কাগজের কীট কমই আছে। কিন্তু কাগজ নিরূপিত সময়ে অবসর মত পাঠ করি। যখন গভীর ভাবাত্মক বিষয় অধ্যয়ন করবার সময় খবরের কাগজ স্পর্শও করি না। সব জিনিসেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, এ তোমরা কখনও ভুলে যেও না।

আত্মচেষ্টায় মানুষ কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারে, তার আর একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে হেন্‌রি টমাস কোলব্রুক। তাঁর সম্বন্ধে দু একটা কথা বলছি। কোলব্রুক হচ্ছেন "Digest of Hindu and Mahommedan Law" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" হবার ১০ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে কোম্পানীর কেরাণী হ'য়ে তিনি এদেশে আসেন। সে সময়ে বিলাতী সমাজের অবস্থা ও নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত দুষ্ট ছিল। মদ, জুয়া ও অন্যপ্রকার দুর্নীতির প্রভাব কোলব্রুক সম্ভবতঃ এড়াতে পারেন নি। তথাপি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ক'রে তিনি অশেষ শাস্ত্রবিৎ হ'য়েছিলেন—বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানলাভ ক'রেছিলেন। ম্যাক্সমূলর ব'লেছেন, তিনি যে কেবল ক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন তা নয়, তিনি সুদক্ষ ব্যবহারজীবী এবং সুপটু অর্থসচিবও ছিলেন। ইউরোপখণ্ডে সংস্কৃত ভাষানুশীলনের তিনিই প্রবর্ত্তক। ১৮০০ সালে তিনি "Condition of Peasantry in Bengal"—"বাংলাদেশে কৃষকের অবস্থা" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। বৈশেষিক দর্শন তিনিই প্রথম ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। বরাহমিহির ও আর্য্যভট্ট থেকে হিন্দু পাটীগণিত ও বীজগণিত অনুবাদ ক'রে তিনিই প্রথম ইউরোপকে দেখান যে, গ্রীকদের পূর্ব্বে হিন্দুরা এ সকল বিজ্ঞানের চর্চ্চা করত—হিন্দুরাই অঙ্কশাস্ত্রে দশমিক প্রথার আবিষ্কারক। হিন্দুদের জ্ঞান প্রথম আরবেরা ও আরবদের নিকট থেকে ইউরোপ শিক্ষা ক'রেছিল। কোলব্রুক আবার জ্যোতির্বিদ্যারও অনুশীলন ক'রেছিলেন। অবসর নিয়ে ইউরোপ প্রত্যাবর্তন করে তিনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং নিজে উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রবন্ধাদি প্রেরণ করে তাকে পুষ্ট করেছিলেন। কণাদের পরমাণুবাদ (শঙ্করের অনুবর্ত্তী মায়াবাদীরা আবার ঠাট্টা করে বলেন কণাদ বা কণভুক্—জগতের অস্তিত্বই নেই, তার আবার পরমাণু !) তিনিই অনুবাদ করে ইউরোপে প্রচার করেন। সেই অনুবাদের প্রথম অধ্যায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার "History of Hindu Chemistry" নামক পুস্তকে অবিকল উদ্ধৃত করে দিয়েছি। জীবনের সব কয়টি দিনের সদ্ব্যবহার না করলে কোলব্রুক একা-

ধারে এত গুণের গুণী হ'তে পারতেন না। **Elphinstone, James, Princep, Horace, Hayman, Wilsor** প্রভৃতি বড় শাসনকর্তা বা এক এক ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা ছিলেন—পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এঁদেরও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকালকার সিভিলিয়ানরা ?—এঁদের "ডেস্ক ওয়ার্কের" থোড়-বড়িখাড়া, আর খাড়াবড়ি থোড় করতেই কর্ম্মশেষ। পঞ্চায়েত থেকে চৌকিদার, ততঃ দারোগা, তারপর ডেপুটি, তদ্ধ্বে ম্যাজিষ্ট্রেট, এই চক্রের মধ্যেই এঁরা পাক খাচ্ছেন। কাজেই কোন অনুসন্ধানের ফলও তদনুরূপ হচ্ছে। যেমন খুলনার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট দিলেন—গাছে ফল প্রচুর, দুধ চাইলেই মেলে, আর মাছ ধ'রে খেলেই হ'ল। লোকে তোফা সুখে আছে—দুর্ভিক্ষ কোথায় ? এঁরা হচ্ছেন লেফাফা-দুরস্ত, অন্য কিছুরই ধার ধারেন না। **Elphinstone** সাহেবের নাম আপনারা শুনেছেন। তিনিই বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ; এদিকে ঐতিহাসিক গবেষণাও যথেষ্ট করেছেন। তাঁর প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও এম-এ পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক। **Malcolm** সাহেব পারস্য দেশে ইংলণ্ডের রাজদূত ছিলেন। সেই সুযোগে পারস্য দেশ সম্বন্ধে নানা তথ্য অনুসন্ধান ক'রে তিনি সেই দেশের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করলেন, যা ঐ দেশ সম্বন্ধে আজও নির্ভরযোগ্য আদর্শ মৌলিক পুস্তক। এঁদের জীবনের কৃতিত্ব ও সফলতার পশ্চাতে রয়েছে সময়ের মূল্য-জ্ঞান ও সদ্ব্যবহার, এ কথা কেহ ভুলে যেন না যাই।

এখন কেউ অভিযোগ করে বলতে পারেন—"ইংরেজ ইংরেজ ; বাঙ্গালী বাঙ্গালী। ইংরেজ যা ক'রেছে, প্রতিকূল ঘটনাচক্রের মধ্যে বাঙ্গালীর দ্বারা তা কি করে সম্ভব হবে ?" আচ্ছা বেশ কথা। আমাদের দেশের লোকেরই দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। রাজা রামমোহন রায় ১৮ বৎসর বয়সে বাঁকীপুরে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তা পারসী ভাষায় লিখিত এবং তার মুখবন্ধের ভাষা আরবী। যখন তিনি অসীম সাহসে ভর ক'রে প্রচলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর পিতা তাঁকে আপন ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কিম্বদন্তী এই যে রামমোহন তারপর হিমালয় পার হয়ে তিব্বত দেশে উপস্থিত হ'য়ে লামাদের নিকট পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জ্ঞান কত গভীর ছিল, তা এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, তিনিই নব্যভারতে প্রথম বেদান্তের বাণী প্রচার করেন। নবদ্বীপ ভাটপাড়ায় তখন স্মৃতি-শাস্ত্রেরই সম্মান ছিল, বেদ উপনিষদের সেরূপ চর্চ্চা ছিল না। ঈশ, কেন, কঠ, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদ্ তিনি প্রথমে এ দেশে বাঙ্গলা ভাষায় এবং পরে বিলাতে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। মাঝ বয়সে রংপুরে ডিগ্‌বী সাহেবের সেরেস্তাদার হ'য়ে তাঁরই কাছে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন। ইংরেজী ভাষায় তিনি যেরূপ পাণ্ডিত্য লাভ ক'রেছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডিত্য এখনকার ভারতবাসীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। লর্ড আমহার্ষ্টের সংস্কৃত কলেজ স্থাপন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের প্রতিবাদ

করে তিনি তাঁকে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। তিনি বলেন দেশে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে; আমরা এখন চাই রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা প্রভৃতি। প্রতিবাদপত্র তিনি বিশপ্ হিবারের হাতে দেন। হিবার বলেছেন—"এমন ইংরেজী কোন এসিয়াবাসীর নিকট পাইনি।" (সুতরাং ইংরেজ পারে, আর দেশের লোকে পারে না—এ কথাই নয়। আসল কথা সর্ব্বপ্রকার সফলতার মূলেই অক্লান্ত চেষ্টা।)

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রেরই যুগ ছিল। বঙ্কিম যে কি অপরিশোধ্য ঋণে দেশকে আবদ্ধ ক'রে গেছেন তা বলাই বাহুল্য। তিনি ডেপুটী ছিলেন; কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে আপন কর্ত্তব্যের কখনও অবহেলা করেছেন, এ অভিযোগ কেহ কখনও করে নি। অবসর নিয়ে শেষ জীবনে সীতারাম, আনন্দমঠ প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছিলেন বটে, কিন্তু কর্ম্মজীবনে তাঁর একদিকে ছিল শ্রমসাধ্য রাজকার্য, অন্যদিকে ততোধিক শ্রমসাধ্য সাহিত্যসৃষ্টি। এই দুইএর কোনটির প্রতিই কোন দিন তিনি আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নি। আপত্তি উঠতে পারে— বঙ্কিমের ছিল ঈশ্বরদত্ত শক্তি, যেন ধ্যানে ব'সে লিখতেন। সুতরাং তিনি যা ক'রেছেন সাধারণে তা কি করে করবে? বেশ কথা। আমি তাঁর অনন্যসাধারণ ও অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলছি না; সাধারণের যা অনুকরণীয় তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ শ্রমশীলতা। বই লেখা ছাড়া তাঁকে "বঙ্গদর্শন" সম্পাদন করতে হ'ত। এই সম্পাদন-কার্যের জন্য তাঁকে সাহিত্য চর্চ্চা ও রাজকার্য্যের পরেও সময় করতে হ'ত। কি বিপুল সে চেষ্টা! বঙ্গদর্শন বাংলাদেশে এক নবযুগ আনয়ন করেছিল। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক গবেষণা, সামাজিক সমস্যার বিচার, বিজ্ঞানরহস্যের পরিচয় প্রভৃতি নানা রসসম্ভারে পুষ্ট হ'য়ে বঙ্গদর্শনের সৌন্দর্যবৃদ্ধি হ'য়েছিল। বাস্তবিক বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর চিত্ত নিত্য নূতন দিকে সাড়া দিয়েছিল। এই পত্রিকা সম্পাদনের জন্য নানা প্রবন্ধ পাঠ ও নির্ব্বাচন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং করতেন। এই জন্য কত দায়িত্ব ছিল এবং কত সময়েই যে তাঁকে ব্যয় করতে হ'ত, তা একবার ভেবে দেখা উচিত। আমাদের তখন ১০।১২ বৎসর বয়স। সাহিত্য-রসবোধ তখনও জন্মায় নি। তবু উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকতাম—বঙ্গদর্শন আবার কখন বাহির হবে। বিষবৃক্ষের দোবে, চোবে, তেওয়ারী, তাদের বংশদণ্ড, সেই লালচাঁদ সিং নাচে তিড়িং মিড়িং, ডালরুটির যম কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম, এই সব তখন বেশ লাগতো। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ পুস্তক; তাদের স্থান সর্ব্বোচ্চ। তখন থেকেই বঙ্কিম-প্রতিভার পূর্ণ উন্মেষ হয়েছিল। যাঁরা অসংখ্য কাজের মধ্যে গুরু পরিশ্রম করে জাতি-গঠনের মালমশলা যুগিয়ে গেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত দেখেও কি আমরা আমাদের শ্রমবিমুখতার কৈফিয়ৎস্বরূপ বলতে থাকব— "আর মশাই পারিনে, অফিসের কাজ, কখন সময় পাই।"

আচ্ছা, রমেশ দত্ত মহাশয়ের কথা ধরা যাক। তিনি সুরেনবাবু ও বিহারী গুপ্তের সঙ্গে সিভিলিয়ান হ'য়ে বিলাত থেকে দেশে ফিরলেন। তারপর বঙ্কিমের পরামর্শে তাঁরই পদানুসরণে কত বাঙ্গালা উপন্যাস লিখলেন। বঙ্কিম ও রমেশ, রবিবাবু বা শরৎবাবু ঔপন্যাসিক হিসাবে কে বড় আমি তার হিসাব করব না, সে সাধ্য আমার নেই। আমার কথা এই—তখন বঙ্কিমের পরেই রমেশ। রমেশচন্দ্র সাহিত্যসেবী, কিন্তু শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর প্রতিভা কারও চেয়ে কোনদিকে কম ছিল না। কিন্তু রাজকার্য্যে তিনি কমিশনর পর্য্যন্ত হ'য়েই খতম হ'লেন! রাজকার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে তিনি উপন্যাস লিখেছেন, বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনামূলক সন্দর্ভ রচনা ক'রেছিলেন, নানা গবেষণা ক'রে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে বেদের বঙ্গানুবাদ ক'রেছিলেন। আশ্চর্য্য শ্রমশীলতা! ফার্লো (লম্বা ছুটি) নিয়ে বিলাত গিয়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৮১৩ খৃঃ হ'তে ১৮৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত বাণিজ্যের সনদ (charter) সম্বন্ধীয় সাক্ষ্যের খাতাপত্র পার্লামেণ্টের দপ্তর থেকে অনুসন্ধান ক'রে, পাঠ ক'রে, আলোচনা ক'রে তিনি **Economic History of India** এবং **India Under Victorian Age** নামক অপূর্ব্ব ও অমূল্য গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেছিলেন। বৈদেশিক রাজশক্তি ও বণিকের চক্রান্তে ভারতের শিল্পবাণিজ্য কি প্রকারে ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে ভারতবাসী দারিদ্র্যের নিম্নতম স্তরে নেমে যায়, অধঃপতনের সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাস রমেশচন্দ্রের এই সকল পুস্তক পাঠ করলে জানতে পারা যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পরে কমিশনের কার্য্য ক'রেও তিনি কত সাহিত্য, কত ইতিহাস রচনা ক'রে গেছেন, তা ভাবলেও আশ্চর্য্য হ'তে হয়। এঁদের দৃষ্টান্ত শ্রমবিমুখকে প্রতিনিয়ত লজ্জা দিক!

অতএব দেখা গেল আমাদের দেশের লোক পারে না, এ কথা একেবারেই খাটে না। মহামূল্য সময় একবার গেলে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। এই যে হাজার হাজার **B. A.** ও **M. A.** বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বাহির হচ্ছেন, এতে আমরা বাস্তবিকই কি উন্নতির পথে বেশী অগ্রসর হচ্ছি? তা যদি হয়, তবে ডিগ্রী-ধারীদের বুদ্ধির বন্ধ্যাদশা ঘুচে যাচ্ছে না কেন? (আমি ত আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী-কাল দেশের ছেলেদের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে আছি। শ্রীমানেরা আমার ত নাতি, আর মা লক্ষীরা সব দিদিমণি। বল ত সব বুকে হাত দিয়ে, কি ক'রে সময় কাটে? কলেজ ক্লাসে ত ছুটির অন্ত নেই, **M. A. M. Sc.** ক্লাস বৎসরে পাঁচ মাস হয়, বাকি সাত মাস ছুটি; এই যে মহামূল্য সময়, এর যথার্থ সদ্ব্যবহার করলে দেশের ছাত্রেরা আজ জীবনের নানাক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে পারতো।) ভবানীপুরে একজন সম্ভ্রান্ত নামজাদা ভদ্রলোক বড় দুঃখেই বলেছিলেন, ফুটবল দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ১৯০৪ সালে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে যখন দ্বিতীয়বার বিলাত যাই, তখন পোর্টসৈদে একজন সঙ্গী জুটে। লোকটি বেশ আমুদে ও রসিক। তিনি বলেছিলেন "আচ্ছা, বল ত, ফুটবল খেলার ধারে লোক

জমায়েৎ হয় ত বিশ ত্রিশ হাজার ? কিন্তু কসরৎ হয় কয়জনের ?" ফুটবল খেলছে ত ২২ জন লোক। আর বত্রিশ হাজারে মিলে মোহনবাগান, ফাউল, গোলকিপার ইত্যাদি চীৎকারে সহর মাথায় ক'রে মাথা খারাপ করবার দরকার কি বাপু ! এ যেন পাহাড় থেকে টেলিস্কোপ নিয়ে যুদ্ধ দেখা, আর আরাম-চৌকিতে বসে অমুক জেনারেলের দোষে এইটি ঘটল ব'লে নিশ্চিন্ত আরামে মন্তব্য প্রকাশ করা। এত বড় মাঠ পড়ে আছে—আকাশের তলে বাতাসের মধ্যে গঙ্গাতীরে প্রকৃতির কোলে গা ঢেলে দাও ; তা নয় ব্যর্থ উত্তেজনায় আপনাকে শুধু হাল্কা ক'রে ফেলচ। এত বড় খোলা মাঠ—যেন জনাকীর্ণ সহরের ফুসফুসের মত—এমন অদ্ভুত জিনিষ আর কোন সহরে নেই, তারই মাঝে আনন্দ আহরণ না করলে চলবে কেন ? আমি ত গত ১৮ বৎসর নিয়মিতরূপে বেড়াই—কত আনন্দ ! তোমরা স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের এ অমূল্য সময় নষ্ট কর কেন ?

সকলেই তোমরা কার্লাইল, কোলব্রুক অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র হবে একথা বলি না। তবু কাজ ত সবারই আছে। সংসারে আপন আপন ক্ষেত্রে সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কাজের কোথাও অন্ত নেই। আমি অনেক জায়গায় ভ্রমণ করি। অনেক স্থানে লোকে অনুগ্রহ ক'রে আমার গলায় বুনোফুলের মালা পরিয়ে দেয়। তার গন্ধে গা বমি করে। লক্ষ টাকার মালিকেরও এমন একটু বাগান নেই যেখানে দুটো গোলাপ, চামেলি ফুল ফুটতে পায়। অথচ আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে ত জমির অভাব নেই। বিলাতে এক কাঠা জমিতে গাছপালা তৈরী ক'রে মানুষ ফুটন্ত ফুলের মধ্যে প্রকৃতির হাসি ফুটিয়ে রাখে। আমি দেখেছি, ৫০।৬০ বৎসর আগেও আমাদের দেশের লোকের এই সকল বিষয়ে সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল। এখন যেন সব সঙ্কুচিত হ'য়ে যাচ্ছে। এখনও যে কোন যুবক ইচ্ছা করলে নিজ হাতে কোদাল পেড়ে বাগান ক'রে তার মধ্যে দুটো গোলাপ, যুঁই চামেলি ফুটিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু সময় কোথায় ? শ্রীমানেরা রাত্রে ৮।১০ ঘণ্টা ঘুম দিয়ে সকাল বেলা উঠে এ পাড়া ও পাড়ায় সমবয়সীদের সঙ্গে পরনিন্দা, পরচর্চ্চার পালা গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে আসেন বেলা বারটায়। আয়িমা দিদিমা রান্নাঘরে গোপালদের জন্যে ব'সে থাকেন—ভাত কড়-কড় ; জ্ঞান নেই মেয়েগুলো ম'রে যায়। তারপর আহারাদি ক'রে ঘুম একেবারে তিনটা চারটা পর্য্যন্ত। আর এবেলা ওবেলা কতবার কিস্তিমাৎ ত আছেই ; গাছতলায় ব'সে তাস পিটে পিটে তাস তেলা হয়ে যায়। ছিঃ ! ছিঃ ! নিশ্চেষ্টতার মধ্যে সফলতা কোথায় ?

আত্মচেষ্টা ও সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা কি অসাধ্য সাধন করা যায় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।) এডিনবরায় অবস্থানকালে আমি ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী পাঠ করি। কি অদম্য পুরুষকার ! দরিদ্রের সন্তান ফ্রাঙ্কলিন কম্পোজিটারের কাজ করতেন। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হ'য়ে শিক্ষা অর্জ্জন করবার উপায় ছিল না, কারণ অর্থাভাব। কিন্তু লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা

হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছিল। তাই কেতাব-ওয়ালার সঙ্গে ভাব করে, ময়লা করব না, পাতা কাটব না, সকাল বেলা ফিরিয়ে দেবো ইত্যাদি প্রকার প্রতিজ্ঞা ক'রে তিনি পুস্তক ধার নিতেন। সকাল বেলা বই ফিরিয়ে দেবার জন্য সময়ে সময়ে সারা রাত্রি অধ্যয়ন ক'রে পুস্তক শেষ করতেন। সঙ্গীরা সকলে মদ খেতো, তিনি খেতেন না ; রুটী ও জল ছিল তাঁর আহার ; তাই ঠাট্টা ক'রে সকলে তাঁকে জলচর জীব বল্‌ত। ইংরেজী সাহিত্য অধিগত করবার জন্য তাঁর অজস্র চেষ্টা ছিল। **Addison's Essay** পাঠ ক'রে তিনি নিজ ভাষায় তার ভাবার্থ লিখতেন, তার পর মূল প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আপন ভ্রম সংশোধন করতেন। সেই ১৭৫০ সালের কথা, ফ্রাঙ্কলিনের বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রতি তীব্র অনুরাগ ছিল। তখন আজকালকার মত কথায় কথায় ল্যাবরেটরীর সুবিধা ত ছিলই না, কোন নূতন তথ্য জানবার আবশ্যক হ'লে ইংলণ্ড থেকে পুস্তক আনিয়ে পাঠ করতে হ'ত। তাঁর অপূর্ব প্রতিভা ঘুড়ি উড়াবার কালে ভিজা সূতার সহযোগে বিদ্যুতের স্পর্শ পেয়ে বিদ্যুৎ-পরিচালক-দণ্ড (**Lightning Conductor**) আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়। এই দণ্ড এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। ফ্রাঙ্কলিনের সময়েই ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বিবাদ বাধে এবং আমেরিকার স্বাধীনতামূলক **No taxation without representation** আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে আমেরিকার পক্ষে একদিকে প্রাতঃস্মরণীয় জর্জ্জ ওয়াশিংটন সেনাদলের অধিনায়ক, অন্য দিকে শক্তিমান ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ডে আমেরিকার রাজদূত ছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ডের বার্ক, চেদাম প্রভৃতি বড় বড় রাজনীতিবিদ্‌গণের সঙ্গে দেখা শোনা ক'রে একটা আপোষে মিট্‌-মাট্ করবার অনেক চেষ্টা ক'রেছিলেন। এ দিকে আবার খুব বড় বৈজ্ঞানিক ব'লে চতুর্দ্দিকে খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তিনি বিজ্ঞান-সমিতি **Royal Society** হ'তে সম্মান ও অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল বড় বড় পুস্তকে ফ্রাঙ্কলিনের কৃতিত্বের কথা নেই, তা অসম্পূর্ণ। আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাসে ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের নাম সুবর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই অসাধারণ কৃতী পুরুষের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল সময়ের সদ্ব্যবহার। প্রতিদিনের কার্য্য সম্পাদনের জন্য ফ্রাঙ্কলিন যেরূপ সময়ের বিভাগ (**Routine**) করেছিলেন, তাঁর অনুসরণ করলে সকলেই উপকৃত হ'তে পারে। রুটিনের মধ্যে সকল জিনিষই ছিল— প্রাতরুত্থান, আত্ম-চিন্তা, আত্ম-জিজ্ঞাসা, সৎপ্রতিজ্ঞা, অধ্যয়ন, কার্যের হিসাব ব্যায়াম, ক্রীড়া, সঙ্গীত, কথাবার্ত্তা, শৃঙ্খলা প্রভৃতি। অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত এই আত্মশাসন-পদ্ধতি পালন ক'রে ফ্রাঙ্কলিন এত বড় হ'তে পেরেছিলেন।

বাস্তবিক সময় ঠিক করে অগ্রসর হতে পারলে এমন কিছুই নেই যা মানুষ পারে না। আমাদের দেশের বড়লোকেরা সাধারণতঃ এমন পাত্র-মিত্র-কোটাল-পরিবৃত হ'য়ে থাকেন যে পাঁচ দিনেও একবার তাঁদের দেখা মেলে না। দুই

বৎসর আগে লালা লাজপত্ রায়ের সভাপতিত্বে যখন কলকাতায় হিন্দুসভার অধিবেশন হয়, তখন মাড়োয়ারী বন্ধুগণ এসে আমাকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হ'বার জন্য অনুরোধ করেন ; কারণ বাংলদেশে অন্য প্রদেশের লোক ঐ পদ গ্রহণ করলে ভাল দেখায় না। সভার কার্য্য-ব্যপদেশে কোন জমিদার-বাটী গিয়ে শুনলুম জমিদার বাবু বেলা ১২টার সময় শয্যাত্যাগ করেন। স্বদেশী কাজে কেউ এসে অনুরোধ করে বল্লেন, অমুক জমিদার-বাটী চলুন, তাঁর সাহায্য পেলে কার্য্যোদ্ধার হবে। অমনি মোটর চড়ে তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখলুম—শান্ত্রীর পাহারা। নিজের নাম ক'রে বাবুকে সেলাম দেবার কথা বলতে শান্ত্রী বলে উঠ্ল, বাবু বেলা ১১৷৷০ টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করবেন না। কি বাদসাহী আলস্য ! আমি ত এই বয়সেও ভোর ৫টা বা তৎপূর্ব্বে গাত্রোত্থান ক'রে থাকি ; চিরকাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ ক'রে এসেছি ; সূর্য্যোদয়ের পরও বিছানায় পড়ে থাকা আমার ধাতে সয় না। যাক্, আমাদের দেশের ধনীদের ত এই ব্যাপার ! কিন্তু ইংরেজ লাট বা গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য চিঠি লিখে অনুরোধ করলে, তিনি যদি দেখা করা উচিত বিবেচনা করেন, তবে সময় স্থির করে সংবাদ পাঠিয়ে দেন। তারপর ৫।৭।১০।২০ জন সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলেও নির্দ্দিষ্ট সময় অনুযায়ী পর পর সকলের সঙ্গেই দেখা করেন। তাঁদের সব কাজের সময় বাঁধা। এ বিষয়ে তাঁরা আর আমরা,—তুলনা কর। কোন কাজের জন্য ইংরেজের কাছে যাও ; সে ৫।৭ মিনিট চিন্তা ক'রে হাঁ বা না একটা জবাব দেবে। কিন্তু দেশের লোকের নিকট যাও ; প্রথমতঃ ৫।৭ বারের চেষ্টায় দেখা মিলবে। তারপর তোমার প্রস্তাবে মনে মনে অসম্মত হলেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে মুখের উপর 'না' বল্তে পারবে না। তারপর হয়ত আশা দিয়ে একমাস হাঁটিয়ে ঘুরিয়ে তোমায় হায়রান ক'রে, হার মানিয়ে ছেড়ে দেবে।

আমরা ত সময়ের মূল্য বুঝি না। তাই ওরা আমরা এত তফাৎ। ওরা দিনের বেলায় ভূতের মতো খাটে। কিন্তু অপরাহ্ণ ৫৷৷ টায় ওদের ব্যবসায় অফিস সব বন্ধ। তখন কেউ মোটর চ'ড়ে হাওয়া খায়, কেউ বা ক্রিকেট, টেনিস খেলে। কিন্তু আমাদের বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা,—যত জায়গায় যত দোকান আছে সব রাত্রি ৯৷৷-১০ পর্য্যন্ত খোলা। এক একখানি ছোট ছোট ঘরে দোকান, ৫ মিনিট তার মধ্যে থাকলে বদ্ধ হাওয়ায় মাথা ধ'রে ওঠে। আমরা সকলে একমত হ'য়ে দোকান-বন্ধের একটা সময় ঠিক ক'রে নিতে পারি না—সকলেরই ভয় আছে, পাছে খদ্দের ভাগে। এমনি ক'রেই আমরা শরীর মাটি করি। ইংরেজ কিন্তু ব্যবসাও জানে, স্বাস্থ্যও বুঝে। কিন্তু আমাদের একি সর্ব্বনাশ ! আমরা সর্ব্বদা ব্যস্ত, আবার সর্ব্বদা অলস। কলকাতায় ইংরেজের ৩টা ঔষধের দোকান আছে। রোগীর সকল সময়েই ঔষধের দরকার হ'তে পারে। তাই ছুটি নিতে হলে, অমুক রবিবার অমুকের দোকান খোলা, এইভাবে পালা করে ওরা

কাজের ব্যবস্থা ক'রে নেয়। আমাদের পাশে পাশে সারি সারি দোকান। কিন্তু আমরা সকলে একমত হ'য়ে সকলের পক্ষে সুবিধাকর এমন কোন বন্দোবস্ত করতে পারি না। সময় স্বাস্থ্য দুই-এরই অপচয় ঘটে, তবু আমরা একটা আইন-কানুনের মধ্যে আসতে পারি না।

এইবার নিজ সম্বন্ধে ২।১ কথা বলি। বয়স ত প্রায় তিন কুড়ি দশ হ'ল; সময় এগিয়ে আসছে। আমি চিররুগ্ন, আলবার্ট স্কুলে তখন কেশব সেনের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনতাম। কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন স্কুলের কর্ত্তা। তিনি ইংরেজী পড়াতেন; তাঁর মত ইংরেজী ভাষার শিক্ষক আজও দুর্লভ। আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম। হকারের দোকান থেকে লাটিন ও ফ্রেঞ্চ ভাষার বই কিনে পড়তাম। বঙ্গদর্শন আগাগোড়া পড়া যেত। সম্প্রতি গত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে আমি নানা কার্য্যোপলক্ষ্যে প্রায় ৯০,০০০ মাইল ভ্রমণ করেছি। (ছাত্র-জীবনেই ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। রাসায়নিক হ'লেও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস চর্চ্চা করবার সময় পাই।) মহীশূরের দেওয়ান সেদিন অভিযোগ ক'রে বলছিলেন আমি নাকি বিজ্ঞান ত্যাগ ক'রে খদ্দর ও অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-প্রচারকার্য্য আরম্ভ ক'রেছি। বিজ্ঞান ত্যাগ করব কেন? বার মাসে বৎসর। প্রতি মাসে ২।৪ দিন খদ্দর প্রচার করলেই সব ত্যাগ হ'য়ে গেল? সায়ান্স কলেজে স্যর্ রাসবিহারী ২১ লক্ষ, স্যর্ তারকনাথ ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে আমাদের হাতে কলেজ সঁপে দিয়ে গেছেন। আমরা হচ্ছি কলেজের ট্রাষ্টি। আমি কি দেশদ্রোহী যে, অবহেলায় তাঁদের গচ্ছিত ধনের অপব্যবহার করব? গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি দার্জ্জিলিং যাই না,—পূজাবকাশে কোথাও নড়ি না। এখন রেলওয়ের যুগ। দেশের দূরপ্রান্তেও ২।৩ দিন অবস্থান ক'রে সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসা যায়। সাধারণে বলেন, একে রুগ্ন শরীর, তার উপর এত পরিশ্রম কি ক'রে করি। প্রকৃত কথা এই যে, সময় বেঁধে কাজ করলে অনেকেই অনেক কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে।

(চা পান না বিষপান? বিশেষ বক্তৃতা দিয়ে আমি ৪৫ বৎসরের চা-পান অভ্যাস একদিনে ছেড়েছি।) মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে কোন বিষয়ে অভিনিবেশ-শক্তি সওয়া ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার অধিক কেন্দ্রীভূত রাখা যায় না। উদরপূর্ত্তি ব্যাপারে যেমন চাট্‌নী অনেক সাহায্যকর, আত্মোন্নতি ব্যাপারে সেইরূপ ছোটখাট নানা কাজের চাট্‌নী অনেক সাহায্য করে। তফাৎ এই—উদরপূর্ত্তিতে চাট্‌নীর সাহায্যে কতকগুলো অতিভোজন করা অনুচিত, আত্মোন্নতি-সাধনে চাট্‌নী খুব দরকার। কোন গভীর ভাবাত্মক বিষয় অধ্যয়ন করতে করতে ক্লান্তিবোধ হচ্ছে। আর ভাল লাগছে না? আচ্ছা চাট্‌নী চালাও,—অর্থাৎ রুচিমত জমি কোপাও, বাগান কর কিংবা গান গাও, খবরের কাগজ পড়, চরকায় সূতা কাট।—এইরূপে বৈচিত্র্যের মধ্যে ক্লান্তি অপনোদন করে, তারপর আবার সেই গভীর বিষয়ের চর্চ্চা আরম্ভ কর।

তা নয়, সমস্ত দিন তাস পাশা আড্ডায় কাটিয়ে মেস-ঘরে রাত্রি জেগে বই প'ড়ে নিজের তথা ঘরের আর ৩।৪ জনের ক্ষতি করা! কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের কথা। ছাত্রদের সম্বন্ধে আমাকে ঠকান যায় না। (আমি ছাত্রদের জহরী বা কামার, যাই বল।) আমার কাছে ফাঁকি দেওয়া চলে না। শ্রীমান্‌দের দৌড় আমি সবই জানি। জাপানের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়েছে ১৮৭০ খৃঃ হ'তে। আমাদের দেশে নবযুগের সূত্রপাত আর এক শতাব্দী পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের সময়ে। আজ জাপান উন্নতির উচ্চ শিখরে,—আর আমরা কোথায়? চীনদেশে—৪৫ কোটী লোক, আমরা ৩২ কোটী। চীনারা গরীব, অন্তর্বিপ্লবে অবসন্ন। ধন্য স্যন্ ইয়াট্‌সেন। যাঁর একনিষ্ঠ সাধনার বলে চীনে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। চীনাদের সুবিধা এই যে তাদের এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম। আমাদের দেশে কিন্তু ভেদের অন্ত নেই;—হিন্দু মুসলমান, রাঢ়ী বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ,—শাখা, প্রশাখা, উপশাখা। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান এত কম যে এরূপ বিবাহ সংঘটিত হ'লে তা খবরের কাগজে ওঠে। আমাদের ছাত্রেরা ত এম্ এ, এম্ এস্-সি, বি এ, বি এস্-সি পাশ করে শুধু চাকরির উমেদারী করে। চীনদেশে চীনা ছাত্রেরা দেশের জন্য কি করেছে সে সংবাদ কে রাখে। মনস্বী **Bertrand Russell** এর নাম বোধ হয় সকলেই শুনেছেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি সন্ধির দিকে ছিলেন ব'লে, যুদ্ধকালে তাঁকে জেলের মধ্যে আটক রাখে। তাঁর **Chinese Problem** নামক পুস্তকে চীনের অভ্যুত্থানে চীনা ছাত্রগণের কর্ম্মচেষ্টা বিবৃত হ'য়েছে। ভার্সেলে সন্ধিতে জাপান টোগোর প্রভাবে, কামানের সাহায্যে মানসম্ভ্রম বজায় রেখে সাণ্টুং লাভ করলে। কিন্তু সন্ধিতে চীনের স্থান হ'ল না। দুর্ব্বল চীনকে গ্রাহ্য করে কে? এই অপমানের ধাক্কায় চীনের যুবকশক্তি জেগে উঠল। চীনে ছাত্র-আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। আমাদের গোলদীঘি-পলিটিক্‌স্ কম হলেই ভাল। চীনা ছাত্ররা তাদের অশিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষার আলোক দেবার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করতে লাগল। জাপানী দ্রব্য বয়কট করলে। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য নানা পুস্তক লিখিত হ'ল—প্রচার-কার্য্য অগ্রসর করবার জন্য নানাপ্রকার বক্তৃতার বন্দোবস্ত হল। ছেলেরা নিজেদের খরচের টাকা বাঁচিয়ে শিক্ষা প্রচারের জন্য ভাণ্ডার স্থাপন করল। নিজেরাই নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা দেবার ভার নিলে। এইরূপ ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পিকিং সহরে আজ পঞ্চাশ হাজার ছেলে লেখাপড়া করছে। (আর তোমরা কি করছ, কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীরা? কেউ ত একবার দেশের নানাপ্রকার দুর্দ্দশার কথা স্বপ্নেও ভাবছ না। কেবল ফুটবল, থিয়েটার, সিনেমা মোহে ডুবে রয়েছ। কাজের কথা উঠলেই মাথা চুলকে নাকি সুরে কৈফিয়ৎ কাটতে থাক—সময় পাই না, স্বাস্থ্য খারাপ।) আমি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই বয়সেও নিয়মিতরূপে বেড়াই! শুনলে আশ্চর্য্য হবে, আমি আজও কাঠবিড়ালের মত সুপারী গাছে উঠতে পারি—

ভগবান আমার দেহটাকে খুব হাল্‌কা ক'রেই তৈরী করেছেন। আর তোমরা আলস্যের মধ্যে শুধু শুধু আড্ডা দিয়ে যাও। (কজন তোমরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পার যে, তোমাদের অশিক্ষিত দেশ-ভাইদের প্রতি আপন কর্ত্তব্য পালন করছ? এত ছুটি, এতগুলো রবিবার; নিজের পাড়ার চামার হ'ক, মেথর হ'ক ১০।১২টা ছেলেকে যদি পড়াও তা হলে ত অনেক হয়। পালা ক'রে ৭ দিনে ৭ জন প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা সময় দিতে পার না?) চীনের ছাত্রগণ ঠিক বুঝেছে। তারা সময় ক'রে সমস্ত দেশে ১০।১২ লক্ষ বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে; দেশের অজ্ঞতা দূর করবার জন্য তারা বদ্ধপরিকর হয়েছে। একবার ভেবে দেখ, এই শিক্ষা-বিস্তারের বিপুল চেষ্টা দ্বারা চীনা ছাত্রছাত্রীরা তাদের দেশের নবজাগরণে কি পরিমাণে সাহায্য করছে। ছাত্র-আন্দোলন কি শুধু বক্তৃতা করা? নৈতিক বলই প্রকৃত বল। গবর্ণমেণ্ট কবে ট্যাক্স বসিয়ে সাধারণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করবে তার জন্যে ব'সে থাকলে চলবে না। আমাদের কি কোনও কর্ত্তব্য নেই? (সাত জন মিলে একটা নাইট স্কুল চালাতে পার না? আমরা কি করছি—বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, ছাত্র?) সব বসে বসে শুধু আলস্য আর গল্প—"তারপর বুঝলে কি না (অমনি এক টিপ নস্য)—মেয়ের বিয়ে, সাহেবকে বল্‌তে অমনি একখানা একশ' টাকার নোট দিলে—আর এখনকার ব্যাপার দেখ না, কংগ্রেস ক'রেই ত সব চটিয়ে দিয়েছে।" ছিঃ! ছিঃ! পিকিং সহরে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। টাকা কম, মেয়েদের আলাদা বন্দোবস্ত তাই হয় না। দেশহিতকর কার্য্যে চীনা মেয়েদের দানও বড় কম নয়। দেশ সম্বন্ধে আমরা যে সব সংস্কারের কথা আলোচনা করি মাত্র, চীন তা কার্য্যে পরিণত ক'রেছে। কি অটল প্রতিজ্ঞা, কি একান্ত সাধনা! আমরা শুধু গল্প ক'রে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বৃথা নষ্ট করছি। আমার দেড় ঘণ্টা মাত্র পাঠের সময়। হয়ত পাঁচজন এলেন সাক্ষাৎ করতে। সবাই বলেন এক মিনিট সময় হলেই চলবে। আরে, আমার যে খেই হারিয়ে যায়। কিন্তু সে কথা বুঝবে কে? অমনি অভিযোগ হ'বে, মশায়, শ্যামবাজার থেকে আসছি। আচ্ছা, আমার সময়ের কি মূল্য নেই? নয়টা থেকে বারটা পর্য্যন্ত ল্যাবরেটরীতে কাজ করছি; অমনি কেউ এলেন, এক মিনিটের কথার আধ ঘণ্টা গৌরচন্দ্রিকা ফেঁদে বসলেন। আমি সকলেতেই রাজী আছি; কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে আমায় একা থাকতে দিন।

(অনেক কাজ প'ড়ে আছে এই হতভাগ্য দেশে। যে যা পার, আরম্ভ ক'রে দাও। সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীও শ্রীরামচন্দ্রকে আপন শক্তিতে সাহায্য ক'রেছিল। এখন আত্মচেষ্টায় অথবা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে ছাত্রগণ নিজের ও দেশের উন্নতিবিধানে তৎপর হও। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতি-অবনতি সময়ের সদ্ব্যবহার অথবা অপব্যবহারের উপরই নির্ভর করে। আপন শক্তির পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করতে পারলে ভগবানের কৃপায় আমাদের হতভাগ্য দেশও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে।)*

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন।

৭

সাধনা ও সিদ্ধি

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

কথারম্ভে মহাত্মা রামমোহন রায়ের পবিত্র নাম গ্রহণ করি—যাঁর সাধনায় বর্ত্তমান ভারতের সকল প্রচেষ্টার সিদ্ধির বীজ উপ্ত হ'য়েছিল, যিনি নব্য ভারতের সৃষ্টিকর্ত্তা, অজ্ঞান-কুসংস্কারাচ্ছন্ন অমানিশায় যিনি জ্ঞানের বর্তিকা হস্তে জীবনের সকল পথে অগ্রসর হয়েছিলেন ; ১০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে যিনি জীবন-বাঁশীতে জাগরণের সুর তুলে সুপ্ত দেশবাসীকে নূতন পথের পথিক হতে আহ্বান করেছিলেন ; ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে যিনি সর্ব্বপ্রথম সংস্কার-চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন ; আধুনিক বঙ্গভাষার অন্যতম স্রষ্টা প্রাতঃস্মরণীয় সেই রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের সিদ্ধির মূলে ছিল তাঁর আজীবন সাধনা। সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই, এই কথাই আজ আমি বাঙালী যুবককে বড় আশা করে বলতে এসেছি। আজ এই জীবন-সন্ধ্যায় জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমি শিখেছি ঐ একটা পরম সত্য—সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই। আজ বাঙালীকে এই পরম সত্যটি গ্রহণ করতে হবে—শুধু মুখস্থ করা নয়, শুধু স্বীকার করা নয়, একেবারে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মহামতি গোখলে বলেছেন—**What Bengal thinks to-day, the whole of India thinks to-morrow**—বাঙালীর মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাই সারা ভারত গ্রহণ করে। রামমোহনের সময় থেকে মস্তিষ্ক-চালনার ক্ষেত্রে বাঙালী অগ্রণী বলে গণ্য হয়ে এসেছে—বাঙলার কোলে অনেক ধর্ম্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক সুলেখক, বৈজ্ঞানিক, দেশবিশ্রুত বাগ্মী জন্মগ্রহণ করেছেন—বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি এক এক ক্ষেত্রে এক এক জন দিক্‌পাল বাঙলার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন। বাঙালী আগুয়ান্ হয়ে চলেছে স্বীকার করি—তবু আজ একবার বাঙালী যুবককে কঠোর আত্মপরীক্ষা করে দেখতে হবে, তার চরিত্রের গলদ কোথায়, অন্তরের কোন বাধাটা তার চলার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

সক্রেটিস বলেছেন, যারা আঠার বৎসর পার হয়েছে, তাদের উপদেশ দিয়ে

কোন ফল নেই। তাই আমার বক্তব্য আজ দেশের যুবকবৃন্দের কাছে—যাঁরা আমাদের ভবিষ্যতের আশা, আমাদের হৃদয়ের ধন। এই সম্পর্কে আর এক কথা এই যে, "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এটা আমার কাছে নিতান্তই বাজে কথা ;—আমি বলি "ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্", অপ্রিয় সত্য বলতে হবে—দেশবাসীকে প্রীতি নিবেদন করে খুব স্পষ্টভাবেই তাদের ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে হবে। (পত্রাবরণে ভগ্ন-স্থান লুকিয়ে রাখলে দুর্গপ্রাচীরও সহজেই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। ঢাকলে অভাব ঘোচে না ; অভাবকে সকল সময়েই মোচন করতে হয় ;—আর তার জন্য চাই কঠোর আত্মপরীক্ষা, আর তীব্র বেগবতী ইচ্ছাশক্তি।)

দুই বৎসর পূর্বে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর বক্তৃতায় একস্থলে কতকগুলি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন। কথাগুলি এই যে, অনেক কষ্টস্বীকার করে এবং যথেষ্ট ধৈর্য্য সহকারে তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠার হাজার গ্রাজুয়েটের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৭০০ জন সরকারের চাকরি করেছেন, তারও অধিক ইস্কুল মাষ্টার হয়েছেন। এই তালিকা দৃষ্টে এঁরা ভবিষ্যৎ জীবনে কি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অতি সহজেই অনুমেয়। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ জীবনের এক-টানা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে জ্ঞান জগতে নব নব পথের সন্ধানে বের হননি। (আর মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে যা সত্য, বাঙালী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে সেই কথাই সর্ব্বতো ভাবে প্রযোজ্য। বাঙলা দেশেও ঐ—একই দশা—কেরানী, মাষ্টার, ডাক্তার আর উকিল। আর সেই গলাধঃকরণ, উদগীরণ, পরীক্ষাপাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, তারপর মা সরস্বতীর সঙ্গে সেলাম্ আলেকম্। মুন্সেফ, ডেপুটী, জজ,—তা মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট বাঙালীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সবাই বাঁধা ওই চাকরির ঘানিতে আর সবার অন্তরের কথা হচ্ছে—"মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।)

আবার এই গ্রাজুয়েট উৎপন্ন করবার শক্তি মান্দ্রাজের চেয়ে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই বেশী। এই ব্যাপারে কলকাতা সবার অগ্রণী—কিন্তু হেসো না, এ সব ঘরের কথা বাইরে না যায়। অসহযোগ, সহযোগ স্বীকার করি না ; এবার ২০,০০০ ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে আর শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন পাশ হবে। কিন্তু একজন উপাধিধারী কি প্রকার কূপমণ্ডুক তা চিন্তা করলে মন বিষাদগ্রস্ত হয়। বর্ত্তমান প্রথানুসারে একজন এম এস্‌সি কিম্বা এম এ-র ভূগোলের কোন জ্ঞান না থাকলেও চলতে পারে। ইতিহাস পাঠও ইচ্ছাধীন। আব্রাহাম লিঙ্কন, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতির নাম শোনেন নি এমন গ্রাজুয়েটও অনেক আছেন। ভূগোল চাই না, ইতিহাস চাই না, দেশের কথা চাই না, পৃথিবীর কথা চাই না—শুধু পাশ করে যাও—ম্যাট্রিক, আই এ, বি এ, ফার্ষ্ট ক্লাশ, সরেস এম এ। উচ্চ শিক্ষিত যুবক হয়ত ম্যাটসিনীর নাম শুনেছেন—গ্যারিবল্ডীকেও হয়ত মস্ত একটি

বীর ব'লে জানেন, কিন্তু কাভুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেই মাথা চুলকাতে আরম্ভ করবেন। যদি প্রশ্ন করি, আমেরিকার অন্তর্বিবাদ (Civil War) কেন হল—এ বিপ্লবে কে কে রথী ছিলেন—লিঙ্কলন, জ্যাকসন্ কে, কোন পক্ষ জয়ী হল, বিরোধের ফলাফলে দেশের লাভ লোকসান কি হল ? তাহলেই ফিলসফির ফার্ষ্ট ক্লাশ এম এ একেবারে অবাক হয়ে হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন ;—এ সব আবার কি ? প্রফেসারের কোন নোটে ত এ সব লাল নীল সবুজ পেন্সিলে দাগ দিয়ে কস্মিন কালে পাঠ করি নি।

চতুর্থবার বিলাত গিয়ে গত বৎসর এই সময়ে আমি দেশে ফিরে আসি। সেখানে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, বারমিংহাম, লীডস্, এডিনবরা প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। অনেক স্থলে এক একটা কলেজ এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়। নানা বিদ্যানুশীলনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, আর প্রত্যেক বিভাগেই পাঁচ ছয় জন ছাত্র সেই বিশেষ বিদ্যা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করছেন। আর পরপর এমন সব বড়লোক ঐ সকল বিদ্যা-মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসছেন, যা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। এঁদের অনেকে একটা বিশেষ বিষয়ের গবেষণার নেশায় ভরপুর হয়ে সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন ! শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ একের শূন্যস্থান অপরে পূরণ করছেন। আর এই সকল বিষয়ের বৈচিত্র্যই বা কি ! এক-খানা "নেচার" তুলে নিয়ে চোখ বুজে তার স্থান খুলে ইউরোপে অনুশীলিত কত রকম বিদ্যার কত রকম রোজনাম্চা যে দেখতে পাওয়া যায় ; সেখানে কত শত অনুসন্ধান-সমিতি ; কত বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরাতত্ত্ববিদ্ প্রভৃতি মানবের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ত পরিপুষ্ট করছেন। ইউরোপের সব দেশে স্বাধীন চিন্তার স্রোত নিয়ত মানবের জীবনকে কত উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে যে তার আর শেষ নেই। কত শত বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে কত শত প্রচেষ্টা, কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, কত একনিষ্ঠ জ্ঞান-সাধকের ঐকান্তিক ঐ সব দেশে বিদ্যার্থিগণের তথা জনসাধারণের চিত্তবৃত্তিকে সদা জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে। ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশর, আসিরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি দেশে লোকে কিরূপ জীবনযাপন করেছিল সেই সকল প্রত্নতত্ত্বের বিচারের ফলে য়ুরোপীয় সুধীবৃন্দ জ্ঞানরাজ্যের এক একটা নূতন দিক উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যার নাম হয়েছে—ইজিপ্টলজি, আসিরিওলজি ইত্যাদি। লেয়ার্ড, রলিনসন, পেট্রি (Layard, Rawlinson, Petrie) প্রভৃতি এই সকল বিদ্যানুশীলনের পুরোভাগে।

তারপর প্রাচ্যের প্রান্তে এসে দেখা যাক। জাপানে তোকিও, কোবে, কিয়াতো প্রভৃতি বিখ্যাত নগরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সৌষ্ঠবে ও জ্ঞানানুশীলনে সর্ব্বাংশে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেবার বিলাতগামী জাহাজে আমার সঙ্গে প্রায় দুইশত ভারতবাসী ছাত্র ইউরোপে চলেছিলেন। এঁদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া সবাই কেমন করে ফাঁকি দিয়ে একটি বিলাতী সস্তা ডিগ্রী

এনে দেশী ডিগ্রীর উপর টেক্কা দেবেন, সমস্ত সময় সেই চিন্তা ও পরামর্শ করছিলেন। আমাদের দেশের যেসব ছাত্র ম্যাট্রিক বা আই. এ, আই. এস-সি. প্রভৃতি পাশ করে বিলাত চলে যান, দেখতে পাওয়া যায় জ্ঞানান্বেষণ তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের চিন্তা, কি করে শীঘ্র একটা বিলাতি ডিগ্রী নিয়ে এসে দেশবাসীর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেবেন। জাপানী ছাত্র আপন দেশে কোন একটি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করবার পর ইউরোপ যান এবং সেখানে সেই বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়ের নিকট অবস্থান করে সেই বিষয়টিই শিক্ষা করেন। আর আমাদের ছাত্রগণ অনেকস্থলে ভিটে-মাটি বেচে, কেউ বা বড়লোকের জামাতা হবার লোভে ডিগ্রী লাভের আশায় মুগ্ধ হয়ে বিলাত যান। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এরূপ ঘটে তা বলছি না। এর ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই। আমাদের ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও মেঘনাদ সাহা বিদেশে একবার জাপানী ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনারা কি লণ্ডনের ডিগ্রী নিতে এসেছেন?" তাঁরা জাতীয় গর্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বলেন, তাঁরা নিজেদের দেশের ডিগ্রীকে কোন প্রকারে হীন জ্ঞান করেন না। আমাদের দেশেরও উক্ত শ্রীমান্‌দ্বয় বিলাতী ডিগ্রীর মোহে স্বাদেশিকতাকে খর্ব্ব করেন নি। এ পরম গৌরবের কথা। বাস্তবিক ঐ সব জাপানী ছাত্র এসেছেন স্যর জোসেফ টমসন, রাদারফোর্ড প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিশারদ্‌দের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জ্জন করবার জন্য, ডিগ্রীলাভের জন্য নয়।

কিন্তু আমাদের কলকতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সেই ১৮৫৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে হাজার হাজার গ্রাজুয়েট উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে ক'জন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে নিজের কিছু দিতে পেরেছে যা একেবারে মৌলিক ও নূতন, যাতে মানবের জ্ঞান পুষ্টিলাভ করে বৃদ্ধি পেয়েছে? কেউই যে কিছু দেন নি এমন কথা বলছি না। ব্যতিক্রম ত আছেই। কিন্তু তাঁদের আজীবন সাধনার ভিতরের কথা বুঝবার চেষ্টা করে—কে তাঁদের অহেতুকী জ্ঞানতৃষ্ণার যথার্থ সম্মান করতে পারে? এখানে যে, সব ছাত্রই ডিগ্রী চাচ্ছেন আর চাকরি করছেন। কোন বিষয়ে কৃতিত্ব ত কেউ দেখাতে পারলেন না। (অধ্যাপক যদুনাথ সরকার দেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি আপন রোজগারের প্রধান অংশ পুরাতন পারসী পুঁথি ক্রয় করতে ব্যয় করে ছেন, পাটনা খোদাবক্স লাইব্রেরীতে বৎসরের পর বৎসর ধরে নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাই মোগলযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি আজ Authority বা প্রামাণ্য পণ্ডিত। তাঁর উপর আর কেউ কথা বলতে পারেন না, এদেশেও নয়, ইউরোপেও নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই এই পাণ্ডিত্যের কারণ নয়—এই কৃতিত্বের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর জীবনের সাধনা।

কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরির দিকে ঝোঁক পড়েছিল। সেই পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্র হ'তে আরম্ভ করে সকলেই আজ চাকরির উমেদার।

হিন্দু কলেজের ছেলেরা যারা মাইকেল-রাজনারায়ণের সমপাঠী—তাঁরা গ্রাজুয়েট হ'লেই প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জের গবর্ণমেণ্ট তাঁদের ডেকে বড় বড় চাকরি দিতেন। এই সময় থেকে মতিগতি যে চাকরির দিকে গেল, সে আর ফিরলো না। (বাঙলার ধনে ইংরেজ-মাড়োয়ারীর সিন্ধুক বোঝাই হ'ল, আর বাঙলার গোপালেরা শান্তশিষ্ট ভাবে ডিগ্রীলাভের সাধনা করতে লাগলেন। সাধনা—ডিগ্রী, তাই সিদ্ধি—চাকরি।)

এইরূপে আদর্শ খাটো হয়ে গেল। তাই গভীর জ্ঞান-সাধনা দেশে প্রতিষ্ঠিত হল না। ভাসাভাসা জ্ঞানেই বাঙালী যুবক সন্তুষ্ট থাকতে শিখলেন। মল্লিনাথ, বল্লভ, তারাকুমার, সারদারঞ্জন—এই সব টীকার সাহায্যে এক সর্গ ভট্টি বা রঘুবংশ প'ড়েই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হলেন, কেউ বা আধ সর্গ প্যারাডাইস লষ্টের নোট মুখস্থ করে ইংরেজী সাহিত্য দখল করে বসলেন। কিন্তু লাইব্রেরী থেকে একখানা বাহিরের বই নিয়ে কেউ পড়ে দেখলেন না—যেহেতু সে পাশ করার কাজে লাগে না। এখন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল একপ্রকার নির্ব্বাসিত হয়েছে; ইতিহাসও না পড়লে চলে। বাস্তবিক কি লজ্জা, কি পরিতাপের কথা যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ এম এ এম. এস-সি.গণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অথবা কুশিক্ষিত। ক্যালেণ্ডারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হারভার্ডকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু সারা দু'বছর ফুটবল ক্রীকেট খেলেছে ও দেখেছে বলে আমার এক বন্ধু যখন আপন পুত্রের এম এ পাশ করা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন, তখন চতুর পুত্র কয়েকদিনের মধ্যে মেস্ থেকে মেসান্তর ঘুরে নোট জোগাড় করলে এবং পরীক্ষকের মন জুগিয়ে চলে অবহেলে পাশ করে ফেলে বাপকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে।

তাই বলি সর্বনাশ হয়েছে এই ভাসা ভাসা জ্ঞানে, আর অতি সস্তা পাশে। ফিস্ক্যাল কমিশনে স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, ঘনশ্যামদাস বিড়লা প্রভৃতি বসবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে এঁদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্যালেণ্ডারে যাঁদের নাম জ্বলজ্বল করছে সেই (Cobden Medallist) স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত বাঙালী যুবক ত ঐ অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের আলোচনায় আহূত হলেন না। স্যর বিঠলদাস ঠাকরসে বড় বড় কলের মালিক—পরন্তু "গোল্ড মেডালিষ্ট" নন। টাকার ব্যাপারে হাতে কলমে কাজ করেন বলে মহামতি গোখলে বাজেট বক্তৃতা প্রস্তুতের কালে তাঁর পরামর্শ বহুমূল্য জ্ঞানে গ্রহণ করতেন। ভারতবর্ষে রেলওয়ে কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে যাঁর মতামত বহুমূল্য বলে বিবেচিত হয় তিনি হচ্ছেন ডিগ্রীহীন সাতকড়ি ঘোষ। চিন্তামণি, কালীনাথ রায় প্রমুখ সংবাদপত্র সম্পাদকগণ অনেকেই ডিগ্রীশূন্য। কিন্তু এঁরা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যেসব মূল্যবান কথা লেখেন, বড় বড় ডিগ্রীধারীগণ তা থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করতে পারেন।

আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক জাতি বলে গর্ব করে থাকি আর ইউরোপীয়দের জড়বাদী বলে গালি দিই। কিন্তু জড়বাদী ওরাই না আমাদের দেশের স্থানে স্থানে কুষ্ঠলয়, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করে! ভারতবর্ষে ৭২টি কুষ্ঠালয় আছে, তন্মধ্যে দেওঘরে যোগীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক স্থাপিত একটি ছাড়া আর সবই ত ওদের। ফাদার ডামিয়েন তাঁর জীবনই ত কুষ্ঠীর সেবায় তিলে তিলে বিলিয়ে দিলেন। আর্ত্তকে একদিকে কেউ কোলে তুলে নিয়েছে, আবার অপর দিকে কেউ কেউ বলছে—ওকে ছুঁয়ো না। বাস্তবিক কি বৈচিত্র্য ওদের জীবনে! জানবার, বুঝবার, পাবার কি দুর্নিবার চেষ্টা। কেউ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করবার জন্যে বৎসরের পর বৎসর চেষ্টা করছেন, তার আয়োজনই বা কত; কেউ বা আফ্রিকা মহাদেশের কিলিমেন্জেরো পর্ব্বতের চিরতুহিনাচ্ছন্ন চূড়ায় কোন চির নূতনকে দেখবার প্রয়াস করছেন। সুউচ্চ গিরিদেশে শ্বাসরোধ হয়ে কেউ বা প্রাণ হারিয়েছে—তবু দৃক্‌পাত নেই। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। মেরু সন্নিহিত প্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানবার জন্য ফ্রাঙ্কলিন, ন্যানসেন, শ্যাকল্‌টন প্রমুখ অনুসন্ধিৎসু কত অসাধ্য না সাধন করেছেন। মানুষের যা সাধ্য তা এরা করবে, আবার মানুষের যা অসাধ্য তাও এরা করবে। কি বিপুল দুর্দ্দান্ত জীবন! উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ইংরেজ হুকার বিচিত্র লতাগুল্মের সন্ধানে সিকিম প্রদেশে গিয়ে সেখানে বন্দী হলেন। তাই নিয়ে যুদ্ধই বেধে গেল। যুদ্ধ জয়ের পর তিনি মুক্ত হলেন। তাঁর **Flora Indica** বর্ণিত সংগ্রহ বিলাতে কিউ গার্ডেনে (**Kew Garden**) কত যত্নে রক্ষিত হয়েছে। আবার পশুতত্ত্ব-বিৎ ইউরোপীয়ান সিংহ-ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসঙ্কুল আফ্রিকার জঙ্গলে খাঁচার মধ্যে বাস করে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছেন—উদ্দেশ্য গরিলা শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বন-মানুষের অভ্যাস ও আচরণ জানবেন; তাদের ত ভাষা নেই, তাই সঙ্কেতে তাদের ভাব-বিনিময় লক্ষ্য করবেন। এমনি অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারেই তাঁরা সত্যের আবিষ্কার করেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যায় টাইকো ব্রেহী, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেলের সম্পর্ক কত নিবিড়, কত গভীর! এত গভীরতা শোণিত-সম্পর্কে কোথায় পাবে? গ্যালিলিও, কেপ্‌লার সমসাময়িক ছিলেন। কেপ্‌লারের অভাবে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলীর আবিষ্কারের পথ সুগম হত না। কত বিনিদ্র রজনীতে উদার উন্মুক্ত অসীম আকাশের দিকে কি আনন্দে কি আশায় এঁরা চেয়ে থাকতেন! কি অমূল্য রত্ন এঁরা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে দিয়ে গেছেন। এঁদের জ্ঞান-সাধনার মূলে গভীর অভিনিবেশ! একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে এঁরা সাধ্য বস্তুর সন্ধান করেছিলেন, তাই সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। জ্ঞানান্বেষণে নিউটন এমনই তন্ময় হয়ে যেতেন যে আপন আহারের কথাই বিস্মৃত হতেন। একদিন নিউটন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ভৃত্য আহার্য্য দ্রব্য সম্মুখে রেখে গেল। তাঁর বন্ধু

কৌতুক করে সেইগুলি খেয়ে নিয়ে হাড়গুলি ঢাকা দিয়ে রাখলেন। ধ্যানভঙ্গের পর আহার করতে গিয়ে নিউটন দেখলেন হাড়গুলি পড়ে আছে। অতএব পণ্ডিতবর সিদ্ধান্ত করলেন তাঁর আহার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু অত মনে নেই। তাই পাছে কেউ ঠাট্টা করে এই আশঙ্কায় চারদিক চেয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। কি আপনভোলা ভাব? এরূপ তন্ময়ত্বের আরও কয়েকটি নিদর্শন দেখাই। রেনেসাঁস যুগে প্যারিস নগরে হোমারভক্ত প্রোটেষ্টাণ্ট স্কালিগার আপন ঘরে পাঠে নিমগ্ন; এদিকে বাহিরে হত্যাকাণ্ড হ'য়ে গেল (Massacre of St. Bertholomew); কত প্রোটেষ্টাণ্টকে খুন করা হল, কিন্তু তিনি পাঠে এমনই তন্ময় যে, হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার তার পরদিন জানলেন। এথেন্সের সৈন্যদলভুক্ত হয়ে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস একটানা ২৪ ঘণ্টা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতেন তবেই ত দুরূহ তত্ত্বসমূহের মীমাংসা পেতেন। গ্রীকদর্শনের তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু। প্লেতো তাঁর শিষ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্ বুদিয়স্-এর বিবাহদিনে গির্জায় কনে এসেছেন, অন্যান্য বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীও উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু বর কোথায়? বরকে ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বরের পাঠগৃহে গিয়ে দেখা গেল তিনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন আছেন। যাঁর বিয়ে তাঁর মনে নেই! রোমান্ সৈন্য যখন আর্কিমিডিসকে খুন করতে এসেছে তখন আর্কিমিডিস বললেন—দাঁড়াও একটু, এই বৃত্তটা নষ্ট করে দিও না, এর প্রমাণটা শেষ করি। বর্ব্বর সৈন্য তাঁকে খুন করে জগতের মহৎ সত্য উদ্ঘাটনের পথ তখন রুদ্ধ করে দিয়ে গেল। এমনই করে আপনহারা হ'য়ে সাধনা না করলে কি কেউ কখনও কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে?

এই নিঃস্বার্থ সাধনায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছে। (যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ—স্বার্থপর ক্রোড়পতির কেউ সংবাদ লয় না। কিন্তু তাঁর অর্থ যখন 'জনহিতায়' ব্যয় হয়, তখন তিনি হন শ্রেষ্ঠ ও মান্য। জ্ঞান-সাধকের সাধনলব্ধ যা কিছু তা পৃথিবীর সকলেরই সম্পত্তি। তাই তাঁরা সকলেরই বড় আপনার জন। কিন্তু আমরা নষ্ট হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কুচিত হয়েছি স্বার্থপরতার প্রভাবে। তাই বিদ্যাক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই আমরা হ'টে গিয়ে পিছনে পড়ে গেছি। সর্ব্বনাশকারী পল্লব-গ্রাহিতা আমাদের নষ্ট করেছে।) ৺প্রতাপ মজুমদার বলতেন "জাপানীরা অপেক্ষাকৃত হাঁদা, বাঙালী অতি বুদ্ধিমান।" কিন্তু সেইজন্যেই বাঙালী আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আত্মঘাতী উদ্যমহীনতা আমাদিগকে স্বল্পায়াসে কৃতকার্য্যতা লাভ করতে চেষ্টিত করে। তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধনা। অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, অর্থ-সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা প্রভৃতি নানা সমস্যায় পড়ে আমরা সব রকমে মাটি হয়ে যেতে বসেছি। এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সহকারে লেগে পড়ে থেকে এক একটি সমস্যার মীমাংসা করতে না পারলে আমাদের আর বাঁচবার আশা নেই।

আর একটা কথা। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে চেষ্টামাত্রেই অথবা কিছুদিনের চেষ্টাতেই যে এই সকল কঠিন সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে যাবে তা কখনই নয়। (সুতরাং কাজ আরম্ভ করেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, প্রয়াসসাধ্য সকল কার্য্যেই করার আনন্দটাই মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ নয়; মৃগয়ায় যেমন অন্বেষণেই আমোদ, তেমনি প্রকৃতির গূঢ় রহস্য যাঁরা উদ্ঘাটন করেন তাঁদের সেই চেষ্টাতেই অপার আনন্দ।) আজ আমাদের তাই এই প্রচেষ্টায় আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। জার্ম্মান দার্শনিক লেসিং সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে, যদি ঈশ্বর এসে তাঁকে বলতেন—তুমি সত্য চাও,-না সত্যের সন্ধান চাও, তবে তিনি জবাব দিতেন—আমি সত্যের সন্ধান চাই, কিসে পাব, কেমন করে পাব, এই সে দেখা দেবে, পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে; এই খোঁজের খেলায় বিপুল আনন্দে আমি ভরপুর হয়ে থাকতে চাই। এই ত প্রাণবন্তের লক্ষণ; বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্তিতে নয়, অন্বেষণে। আর এই অন্বেষণ বা সাধনা একই কথা।

ধর্ম্মজগতে বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য– এঁদের সিদ্ধিলাভের ইতিবৃত্ত একই। জনকোলাহলের বাহিরে পর্ব্বতে জঙ্গলে, গুহার মধ্যে জীবনের কিয়দংশ সাধনা করে এঁরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অরণ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃহদারণ্যক উপনিষদ গ্রথিত হয়েছে। আবার বুদ্ধদেবেরও অপর নাম এইজন্য "সিদ্ধার্থ"। আমরা অতীতের গর্ব্ব করে থাকি। কিন্তু অতীতের প্রাণের লক্ষণ-গুলিকে আপন জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চাই না;—অতীতের সিদ্ধির উপর আমাদের লোভটুকু ষোল আনা আছে, কিন্তু তার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার কথা শুনেই আমরা আতঙ্কে মরে যাই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা আজ শতদল পদ্মের মত বিকশিত হয়েছে। কিন্তু একটির পর একটি করে এই শতদল ফুটেছে—এর পিছনে আছে একনিষ্ঠ সাধনা। গোখলে ইস্কুল মাস্টার ছিলেন, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও ছিলেন। পরাঞ্জপেও তাই। ৭৫৲ টাকা মাহিনায় গোখলে ফার্গুসন কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু গোখলে আজ দেশপূজ্য, তার কারণ তিনি দেশসেবার সাধনা করেছিলেন। এই দারিদ্র্যব্রতধারীর বাজেট-বক্তৃতায় ব্যবস্থাপক সভায় লাট কর্জ্জন কাঁপতেন। আর এক প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষীর কথা বলে আমার কথা শেষ করি;—তিনিও দারিদ্র্যব্রতধারী মহাসাধক মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী আজ বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু একদিনেই কি তাঁর নাম সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে? ২১ বৎসর পূর্ব্বে আলবার্ট হলে দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্দ্দশা দেশবাসীর নিকট বিবৃত করতে আমিই প্রথম তাঁকে আহ্বান করি। স্বর্গগত নরেন্দ্রনাথ সেন সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। গান্ধীর বক্তৃতার বিষয় ছিল—কেপ কলোনীতে (Cape Colony) ভারতবাসীর অশেষ দুর্দ্দশার কথা। মহাত্মা তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের নেতা। তিনি দেশবাসীর হিতের জন্য আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। নেটাল প্রদেশে

তিনি তাদের সকলের সঙ্গে তুল্যভাবে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন। মাসে পাঁচ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন, সবার ব্যথাকে বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কতবার জেলে গেছেন, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, মেথরের কাজ পর্য্যন্ত করেছেন। তাই ত তিনি আজ জনসাধারণের হৃদয় মন অধিকার করতে পেরেছেন। আজ অন্ততঃ সাতাশ আটাশ বৎসর যাবৎ তিনি নিগৃহীত ভারতবাসীর নেতা—যেখানে অত্যাচার উৎপীড়ন, সেইখানেই মহাত্মা গান্ধী ; তাই আজ তাঁর নামে দলিত জনসঙ্ঘের প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে—আশায় উৎফুল্ল হয়। এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবের পশ্চাতে রয়েছে মহাত্মাজীর আজীবন সাধনা।

রামমোহন রায়কে বাঙালীর ঘরে পাঠানো বিধাতার একটি বিশেষ বিধান বলে আমার মনে হয়। (আমার স্থির বিশ্বাস, বাঙালীর দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই গৌরবের পদ অধিকার করতে হলে বাঙ্গালীর জীবনে আজ চাই সাধনা—তিল তিল করে আত্মদান। বাঙ্গালী আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে, ব্যক্তিগত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লেগে পড়ে থাকলে ভারতের নিদারুণ দুর্দ্দশা ঘুচবেই। আজ বিধাতার ইঙ্গিত—বাঙালীর সাধনা ভারতে সিদ্ধি আনয়ন করবে।)*

* বক্তৃতাটি 'প্রবাসী' ১৩২৯, বৈশাখ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে এই বক্তৃতা দেন।

৮

শ্রমের মর্যাদাবোধ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বর্তমান জগতে রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে তিন চারি জন মহাশক্তিশালী পুরুষকে সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্য বিধাতারূপে গণ্য করা যাইতে পারে—পর পর তাঁহাদের জীবন কাহিনী হইতে সর্বাগ্রে তাঁহাদের বাল্য জীবনের সংগ্রামের বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

যাঁহারা 'with a silver spoon in the mouth' লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, নিজের পুরুষকার এবং কর্মবলেই পৃথিবীতে উচ্চপদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষত এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের বাল্যজীবনের কঠোর দারিদ্র্য এবং ভীষণ জীবন সংগ্রামের কথা লোক সমক্ষে বর্ণনা করিতে কখনও কোন প্রকার লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না।

ইংলণ্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার বাল্য জীবন সম্বন্ধে বলেন "আমি জীবনে আজ সফলকাম হইয়াছি—অনেক দুঃখ কষ্ট এবং বিরুদ্ধ স্রোতের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিয়াছি। কিন্তু এক দিনের তরেও আমার বাল্য জীবনের কথা ভুলিয়া যাই নাই। পরম সুখের দিনে সেই সকল কথাই আমার বেশী করিয়া মনে পড়ে। [একদিনের কথা বলি—খুব ভোরে উঠিয়া আলুর ক্ষেতে ঝুড়ি লইয়া আলু তুলিতে গিয়াছি। সেদিন দারুণ শীত, চারিদিকে ভীষণ তুষারপাত হইতেছে। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় মুখ, হাত, পা জ্বালা করিতেছে। কষ্ট সহ্য করা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, চোখ দিয়া জল পড়িবার মত অবস্থা। কাজে একটু বোধ হয় ঢিলা পড়িয়াছে—এমন সময় পরিদর্শক আমার গালে ভীষণভাবে এক চড় মারিল। আমার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।] এখনও সেই দিনের কথা মনে হইলে আমি বেদনা অনুভব করি। পার্লামেণ্ট হাউসে বসিয়াও আমার এই দিনের কথা প্রায়ই মনে হয়—সেই প্রহারের বেদনা যেন নূতন করিয়া অনুভব করি। এই সময়ের সুখের স্মৃতিও আমার আছে। দিনের কাজ শেষ করিয়া যখন দল বাঁধিয়া গান

করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতাম, তখন আমাদের সঙ্গে রঙিন কাপড়ের পোষাক পরিয়া একটি মেয়ে ৩।৪ বৎসরের একটি ছেলের হাত ধরিয়া যাইত—তাহার কথাও আজ বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে।"

("আমার বাল্যকালের আর একটি ঘটনার কথা বেশ মনে আছে। কোন কারণ বশতঃ পাদরীগিরির চেষ্টা ছাড়িয়া এক ব্যক্তি লসিমাথের রাস্তায় ঠেলাগাড়ী লইয়া ছেঁড়া নেকড়া এবং হাড় সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত (বিক্রয়ের জন্য)। তাহার ঠেলাগাড়ীর সামনে একটি ফ্রেমে বই পাতা-খোলা অবস্থায় পড়িবার মত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। 'হাড় গোড় বিক্রি, ছেঁড়া ন্যাকড়া বিক্রী' হাঁকিতে হাঁকিতে সে পথ চলিত এবং সামান্য একটু অবসর পাইলেই বই পড়িত। ইহার কথা এত করিয়া মনে থাকিবার কারণ এই যে—সে আমার হাতে একদিন একটি বিশেষ বই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে,—তুমি এই সব বই পড়তে ভালবাস নাকি?—আমি 'হাঁ' বলাতে সে আমাকে একখণ্ড গ্রীক ভাষায় লিখিত হেরোডোটাসের ইতিহাস পড়িতে দিল। ইহার পর সে বেশ কয়মাস আমাকে নানা প্রকার পুস্তক দিয়া বহু সাহায্য করে। এই ব্যক্তি অবস্থার বৈগুণ্য জন্য বিদ্যালয় ছাড়িয়া ঠেলা-গাড়ী ঠেলিয়া জীবিকা অর্জন করিত, কিন্তু এই ভীষণ দারিদ্র্য এবং দুঃখকষ্টের মধ্যেও নিজের পড়িবার অদম্য উৎসাহ দমন করিতে পারে নাই। অতি হীন কাজের মধ্যেও নিজের পড়িবার সুবিধা করিয়া লইয়াছিল।)

ইটালীর বর্তমান ভাগ্যবিধাতা কর্মবীর মুসোলিনীর দিন এক সময় কঠিন দারিদ্র্য এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে—এমন গিয়াছে যে ক্ষুধার তাড়নায় তিনি পাগলের মত হইয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল স্থির, লক্ষ্য ছিল ধ্রুব,—তাই সকল কষ্ট, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আজ একটি প্রকাণ্ড রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। দেশের রাজাকেও আজ মুসোলিনীর কথামত চলিতে ফিরিতে হয়।

জীবনে মুসোলিনীকে কি প্রকার কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় তাহার দু-একটির দৃষ্টান্ত এই স্থানে দেওয়া হইল।

"মুসোলিনী" লোজানে আসিয়া প্রথমে কোন কাজই পান নাই। এবং জীবনধারণ করিবার মত কোন কাজের জন্য তাঁহাকে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল। কাজ পাইবার পূর্বে তিনি নিদারুণ কষ্ট পাইয়াছিলেন। এমনও হয় যে একবার পয়সার অভাবে তাঁহাকে অনেকের নিকট সাহায্য চাহিতে হইয়াছিল, এবং আর একবার ৩৬ ঘণ্টা অনশনে থাকিবার পর তিনি সামান্য এক টুকরা রুটি পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়াছিলেন। রোসাটে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন রাত্রে মুসোলিনী এক বাড়িতে কয়েক জনকে অঙ্গনে বসিয়া খাইতে দেখিয়া কিছুক্ষণ ইতস্তত করিবার পর সাহস করিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের আর রুটি আছে কি?" হঠাৎ এইরূপ একজন লোকের আবির্ভাবে

সকলেই অবাক হইয়া গেল। মুসোলিনী বলিলেন, 'আমাকে এক টুকরা রুটি দিন।' কোন উত্তর নাই। অবশেষে গৃহকর্তা এক টুকরা রুটি মুসোলিনীকে দান করিলেন। তিনি ধন্যবাদ দিয়া বাহিরে গেলেন। কেহ কোন কথা না বলিয়া কেবল এক টুকরা রুটি ছুঁড়িয়া দেওয়ায় মুসোলিনী অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন—তিনি এই রুটির টুকরা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্য হাত উঠাইলেন, কিন্তু দারুণ ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহার উত্তোলিত হস্ত মুখে আসিয়া ঠেকিল। শেষকালে তিনি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে সেই রুটি পথ চলিতে চলিতে খাইয়াছিলেন।

১৯২৭ সালের মার্চ মাসে ইটালীর অনেক সংবাদ পত্রে মুসোলিনীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। ঘটনাটি পিয়োত্রোনাভে নামে বের্গামোবাসী একজন গৃহনির্মাতা লিখিয়াছেন।

'এই সময়ে মুসোলিনী কাজের অন্বেষণে লোজানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। একদিন সকালে আমার স্ত্রী বাজার হইতে কিছু জিনিসপত্র কিনিয়া ফিরিতেছিলেন. এমন সময় একটি পুলের উপরে ছাই রঙের পোষাক পরিহিত এক যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি ইটালিয়ান?' আমার স্ত্রী বলিলেন, 'না, আমি বের্গামোস্কা।' এই কথা শুনিয়া যুবকটী অল্প হাসিয়া বলিলেন, 'দেখুন আমি কাজ খুঁজছি, আপনি কি আমায় এমন কোন লোকের কাছে পাঠাতে পারেন, যিনি আমায় কোন কাজ দিতে পারেন?' এই কথা শুনিয়া যুবকটিকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমার স্ত্রী আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; আমি তখনই তাহাকে মজুরের কাজে নিযুক্ত করিয়া পরদিন হইতে আসিতে বলিলাম।"

সুইজারল্যাণ্ডে শীত খুব বেশী বলিয়া শীতকালে সেখানে গৃহ নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকে। মুসোলিনী এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও নৈশ-বিদ্যালয়ের ক্লাসে যাইতেন, কিন্তু দৈহিক পরিশ্রমের কাজ একেবারে ছাড়িতেন না। তিনি কোনও দোকানদারের অধীনে কুলির কাজ লইয়া মালপত্র খরিদ্দারের বাড়ীতে বহন করিতেন; ইহাতে তাঁহার যে আয় হইত তাহা হইতে তিনি খাবার খরচ ও পড়াশুনার খরচ চালাইতেন।

রুসিয়ার রাষ্ট্র অধিনায়ক ও সর্বেসর্বা ষ্টালিন (Stalin) বাল্যকালে তাঁহার পৈত্রিক ব্যবসায়—"জুতা-সেলাই" অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। কিন্তু অবসর পাইলেই পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতেন। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট হুভারও বাল্যজীবনে ঘোড়ার সহিসগিরি করিয়া দিন গুজরান করিয়াছিলেন।

ইতিহাস পাঠে দেখা যায়—পৃথিবীর সর্বত্রই যে সকল মহামানব সামান্য অবস্থা হইতে সংগ্রামের পর সংগ্রাম করিয়া জীবনে সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অতি অসম্ভব দুঃখ এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজের পথ হারান নাই—সকল অবস্থাতেই তাঁহারা পূর্ণ আশা ও উদ্যম লইয়া কাজ করিয়াছেন। সামান্য বাধা-

বিপত্তিতে যাহারা নিরাশ হইয়া স্রোতে গা ভাসায়, তাহারা জীবনে কখনও সাফল্যলাভ করে না। উপরে যে কয়জন কর্মবীরের কথা লেখা হইল তাঁহারা যদি সংগ্রামে পশ্চাদপদ হইতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাদের নাম, আমরা দূরের কথা, তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের লোকেরাও শুনিতে পাইত না। যুগের পর যুগ ধরিয়া যে বিস্মৃতির পথে অগণিত মানব-স্রোত চলিয়া গিয়াছে—তাঁহারাও সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইতেন।

বাঙ্গালীকে যদি আজ দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। 'বাংলা দেশে বাঙ্গালীর স্থান যে কোথায়' তাহা পূর্বে বহুবার বলিয়াছি। বাঙালী আজ সামান্য চাকুরিয়া মাত্র। বাঙালী আজ 'বাবু' বলিয়া পরিচিত। সামান্য কায়িক পরিশ্রমে বাঙালী অপমান বোধ করে। বাঙালী বিনা অন্নে প্রায় ধ্বংসের পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইভাবে চলিলে আর পঞ্চাশ বছর পরে বাংলা দেশে জনকয়েক উকীল মোক্তার ও জনকয়েক আপিসের বাবু ছাড়া আর বাঙালী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"*

* প্রবাসী—মাঘ, ১৩৩৯

৭

ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্র

বিজ্ঞান-শাস্ত্রসমূহের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্রই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল। বিগত মহাযুদ্ধের প্রথম সময় প্রমাণিত হইয়াছে, যে, একমাত্র রাসায়নিক বিদ্যায় সমধিক পারদর্শিতা হেতু জার্মানজাতি কিরূপে পৃথিবীর বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন। নয়নমুগ্ধকর রঙ্ সমূহ তাঁহারা কয়লা হইতে উৎপন্ন আলকাতরা হইতে প্রস্তুত করিয়াছেন। এই রঙের ব্যবসায়েই তাঁহাদের কোটি কোটি টাকা লাভ হইতেছিল। তদ্দেশীয় রাসায়নিকগণের কার্যকুশলতা প্রভাবেই তাঁহারা বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে, যুদ্ধ-ঘোষণার ছয় মাসের মধ্যেই জার্মানীকে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শান্তি ভিক্ষা করিতে হইত।

নাইট্রিক এসিড যুদ্ধোপকর্মের একটি প্রধান উপাদান। পূর্বে ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার চিলি হইতে আনীত সোরার দ্বারা উহা প্রস্তুত করা হইত। যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা সোরার সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিলে, জার্মান রাসায়নিকেরা নাইট্রিক এসিড্ তৈয়ার করিবার জন্য অন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা বায়বীয় অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন হইতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিক এসিড্ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই আবিষ্কারের ফলেই তাহারা ৫ বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল যুদ্ধ চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রসায়নশাস্ত্র কেবল ধ্বংসই শিক্ষা দেয় না, মানুষের প্রভূত মঙ্গলও করিয়া থাকে। ডিনামাইটের দ্বারা যেমন ধ্বংসসাধন হয়, তেমনই খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিতে এবং পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গাদি প্রস্তুত করিতেও ইহা অদ্বিতীয়। অস্ত্রচিকিৎসায় ইথার এবং ক্লোরোফর্ম মানুষের চৈতন্যলোপ করে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য গুণাবলী সংবলিত ঔষধসমূহও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সত্যসত্যই রসায়নশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত চিকিৎসাশাস্ত্র চলিতে পারে না। একথা প্রাচীন ভারতের পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য। "রসায়নঞ্চ তদ্‌জ্ঞেয়ং যজ্জরা-

ব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজম্”—অর্থাৎ যে সমস্ত ঔষধ রোগনিবারক এবং যাহা জরামরণ নিবারণ করিয়া যৌবন আনয়ন করে, তাহাই রসায়ন। এবং যে শাস্ত্র এই সমস্ত ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষাপ্রদান করে তাহাকে রসায়নশাস্ত্র বা রসায়ন-বিদ্যা বলে। প্রাচীন তন্ত্রসমূহে (রসার্ণব ও রসহৃদয়) লৌহ, পারদ এবং অন্যান্য ধাতুগঠিত ঔষধের নানাবিধ প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। সেগুলিতে পারদ-ঘটিত ঔষধের দীর্ঘজীবন আনয়নের গুণ বিশেষরূপে কীর্তিত আছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপ যখন কুসংস্কার ও অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন, এদেশে তখন রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মৎ-প্রণীত 'হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে' এই বিষয়ে প্রাচী ও প্রতীচীর তুলনা করিয়াছি। রসার্ণব এবং অন্যান্য রাসায়নিক তন্ত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, উক্ত সময়ে ব্যবহারিক রসায়নশাস্ত্রে আমাদের দেশ ইউরোপ অপেক্ষা অগ্রগামী ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, **Copper Sulphate, Blue Vitriol** এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ হইতে তাম্র, এবং Calamine হইতে দস্তা বহির্গত হয়, ইহা এদেশে উত্তমরূপে জানা ছিল। অগ্নিশিখার রঙদর্শনে খনিজ দ্রব্যের ধাতু স্থিরীকরণের বিদ্যাও উল্লেখযোগ্য। ঐ সমস্ত গ্রন্থে বর্ণিত বায়ু-নিষ্কাশন প্রণালী এমন সুন্দর ও সম্পূর্ণ যে, উহা কোনওরূপে পরিবর্তিত না করিয়া আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এদেশে ঔষধ প্রস্তুতকরণে আরও অধিকতর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দুই হাজার বৎসর অথবা আরও কিঞ্চিদধিক কালের পূর্বে চরক ও সুশ্রুত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ গ্রন্থরূপে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। দেবমুখনিঃসৃত বলিয়া বর্ণিত হওয়াতেই হউক, বা হিন্দুদিগের প্রকৃতিগত চরিত্রগুণে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই হউক, এই সকল প্রামাণিক গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত বচনের আশঙ্কা নাই। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করিলে বুঝা যায়, ডাক্তার হর্ণেলের সম্পাদিত বোয়ার হস্তলিপিতে অধিকাংশ ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণের সহিত সুশ্রুত ও চরকের প্রস্তুত-প্রণালীর সামঞ্জস্য আছে; কোন কোন স্থানে অবিকল নকল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যথা—চ্যবনপ্রাশ। আমীর আলির "আরবেরা ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কর্তা ও নব্য ঔষধালয়ের স্থাপয়িতা"—এ উক্তির সারবত্তা কিছুই নাই।

কেবল যে আয়ুর্বৃদ্ধিকর ঔষধ প্রস্তুত-করণই রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ, তাহা নহে; লৌহ, তাম্র প্রভৃতি হীন ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করাও ইহার উদ্দেশ্য ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপেও এই ব্যাপারে অনেকে মস্তিষ্কচালনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন রাসায়নিক তন্ত্র হইতে এই বিষয়ে পাঠকবর্গের কৌতূহলোদ্দীপক কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

স্বর্ণ বা সুবর্ণতন্ত্র নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে; ইহার পাণ্ডুলিপি আমি কাশী ও ঢাকা রমনা কালীর মঠ হইতে সংগ্রহ করি। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য

বিষয় এই—পরশুরাম কশ্যপ ঋষিকে ভূমিদান করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। এখন তিনি অনাহারে মারা যাইতেছেন। এইজন্য মহাদেব সুবর্ণের প্রক্রিয়া বলিয়া দিতেছেন,—পারদকে এমন অবস্থায় পরিণত করিবেন যে, তাহার সংস্পর্শে অষ্টধাতু সুবর্ণ হইয়া যাইবে।

শুধু তাহাই নহে, এই গুণবিশিষ্ট পারদ ভক্ষণ করিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সুবর্ণীকরণ বিষয়ে বা পরশপাথর প্রস্তুতকরণে রুদ্রযামল তন্ত্রেও অনেক মজার কথা আছে। এই তন্ত্রখানি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন ও প্রামাণিক।

দুঃখের বিষয়, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পর হইতে ভারতে এ বিষয়ে অবনতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের জ্ঞান-প্রদীপ নিবিয়া যায়। এখন আর অতীতের স্মৃতি লইয়া গৌরব করিলে চলিবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বহু শতাব্দীর আলস্য ও জড়তা পরিহারপূর্বক কর্মপথে ধাবিত হইতে হইবে। নচেৎ আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।*

---

* বসুমতী—অগ্রহায়ণ ১৩২৯

১০

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার নিদর্শন

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

রসায়ন বিজ্ঞান কি, তা হয়ত তোমরা অনেকেই জানো না। যা কিছু পদার্থ আমরা দেখতে পাই এবং ব্যবহার করি তার উপাদান কি—সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান-লাভ করা এবং কোন্ কোন্ উপাদানের পরস্পর সংযোগে কি উপায়ে মানুষের প্রয়োজনীয় নানা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করা যেতে পারে, তার প্রণালী উদ্ভাবন করাই রসায়ন বিজ্ঞানের প্রধান সত্য।

যেমন ধরো – টিফিনের সময় আজ তোমাদের 'সন্দেশ' দেওয়া হয় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জানতে চায় যে 'সন্দেশ' পদার্থ কি ? কি কি উপাদানে তা প্রস্তুত হয়েছে, তাহলে রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে তা বিশ্লেষণ করে জানা যাবে যে, 'ছানা' ও 'চিনি'র সংযোগে তা প্রস্তুত হয়েছে। আবার 'ছানা' পদার্থ কি, জানতে ইচ্ছা হ'লেও রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে তা' বিশ্লেষণ করে জানতে পারবে যে তার উপাদান হচ্ছে 'দুগ্ধ'। আবার 'দুগ্ধ' পদার্থ কি কি উপাদানের সংমিশ্রণে সৃষ্ট, রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে তাও বিশ্লেষণ করলে জানতে পারবে। এইভাবে আবার 'চি'নি' পদার্থ কি কি উপাদানে প্রস্তুত তাও জানা যাবে। এবং এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ হ'লে তখন সেই সকল উপাদানের কোন্‌টির সঙ্গে কোন্‌টি মেশালে রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে বেশ একটি নূতন মুখরোচক পুষ্টিকর ও সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে তার উপায়ও উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়।

তোমরা যে কাগজে যে কালি দিয়ে লেখো, যে কাচের গ্লাসে জল খাও, যে চীনে মাটির কাপ-ডিসে চা খাও তা রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যেই সৃষ্টি হয়েছে। যত রকম রং তোমরা দেখতে পাও রঙীন ছবিতে, শাড়ীতে, ব্লাউজে, পর্দায়, ছিটে, সমস্তই রসায়ন বিজ্ঞানের দান। অসুখের সময় তোমরা যে সমস্ত ঔষধ সেবন ও ব্যবহার করে চট্‌পট্ সেরে ওঠো তা'ও রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যেই উদ্ভাবন করতে পারা গেছে।

আধুনিক বিজ্ঞান জগতে ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানই অগ্রণী।

বিজ্ঞানের সাহায্যেই তারা এত বড় ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে। দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার মূল ভিত্তিই হচ্ছে বিজ্ঞান। বর্তমানে আমরা ইউরোপ, আমেরিকা এমন কি জাপানের কাছেও রসায়ন বিজ্ঞানাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীর স্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তোমরা হয়তো জানো না যে, অতীতকালে এমন একদিন ছিল যেদিন ভারতবর্ষ জগতে কৃষি, পশুপালন ও বিজ্ঞান চর্চায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল।

আজ আমি তোমাদের সেই প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চার কয়েকটি নিদর্শনের কথা বলবো। যীশু খ্রীষ্ট জন্মাবার তিন শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে নাগার্জুন নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চায় তিনি অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর একাগ্র চেষ্টা ও সাধনার ফলে সেই প্রাচীন কালেও বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কার হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর* সহরের কাছাকাছি একটি নিভৃত নির্জন পাহাড়ের উপর নাগার্জুনের রসায়নাগার বা বিজ্ঞান অনুশীলন মন্দির এখনও দেখা যায়। তোমরা যদি কখনও নাগপুরে যাও এই নাগার্জুন মন্দির দেখে এসো।

'চরক' ও 'সুশ্রুত' নামে দু'খানি প্রসিদ্ধ প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র আছে। দু'খানি পুস্তকে অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই দু'খানি অমূল্য গ্রন্থ খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্বে রচিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের এই দু'খানি গ্রন্থে এমন এক চমৎকার রাসায়নিক প্রণালী ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত-বিধির বর্ণনা আছে যা যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় সতেরো-শো বছর পরে ইউরোপে যে সব বিজ্ঞানের বই রচিত হয়েছিল কেবলমাত্র তাইতে দেখতে পাওয়া যায়। তার আগে ওদেশের কেউ এর সন্ধান জানতো না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তোমাদের আজ ক্ষার প্রস্তুতের কথা বলবো।

ক্ষার সাধারণতঃ আমরা ময়লা কাপড় পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করি। অনেকে আজকাল সোডা দিয়েও কাপড় কাচেন। কাপড় কাচবার জন্য এবং গায়ে মাখবার জন্য আমরা যে সাবান ব্যবহার করি তারও উপাদান 'ক্ষার'। সাধারণতঃ দু'রকম ক্ষার আছে। একটীকে বলে মৃদু ক্ষার (**Mild Alkali**), অন্যটীকে বলে তীক্ষ্ণ ক্ষার (**Caustic Alkali**)। কাপড় কাচবার জন্যে যে সোডা ব্যবহার হয় সেটা মৃদুক্ষার অর্থাৎ এর ক্ষারধর্ম বা ক্ষারগুণ খুব বেশী নয়; কিন্তু সাবান প্রস্তুতের জন্য যে ক্ষার ব্যবহার হয় সে হচ্ছে তীক্ষ্ণক্ষার অর্থাৎ তার ক্ষারধর্ম বা ক্ষারগুণ খুবই প্রবল। ইউরোপে মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রাসায়নিক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ক্ষারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখা যায়; কিন্তু খ্রীষ্ট জন্মের বহু বৎসর পূর্বে ভারতীয় ঋষিদের

---

* বর্তমানে এই সহর মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

রচিত গ্রন্থে এর যে সুন্দর বর্ণনা আছে, সুশ্রুতের 'ক্ষার' প্রস্তুতকরণ অধ্যায় তা সপ্রমাণ করে।

আমাদের ছেলেবেলায়, প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে, আমরা দেখেছি, গাঁয়ের গরীব লোকেরা কলার 'বাসনা' পুড়িয়ে ছাই করতো। সেই ছাইয়ের সঙ্গে তারা চুণ মিশিয়ে একটি হাঁড়িতে জল দিয়ে ফুটিয়ে সেই ফুটন্ত জলে কাপড় সিদ্ধ করে ময়লা কাপড় পরিষ্কার করতো। স্থলজ উদ্ভিদ পোড়ালে যে 'মৃদুক্ষার' হয় তাকে বলে পটাশ বা পটাশিয়াম কার্বনেট, কিন্তু সামুদ্রিক উদ্ভিদ পোড়ালে যে মৃদুক্ষার হয় তাকে বলে সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট। আবার এদের সঙ্গে চুণ মিশিয়ে ফুটিয়ে নিলে যে 'তীক্ষ্ণক্ষার' হয় তাকে বলে—কষ্টিক এ্যালকালি, কষ্টিক পটাশ বা কষ্টিক সোডা। সুশ্রুতের ক্ষার প্রস্তুতকরণ অধ্যায়ে এইসব বিবরণ বেশ সুন্দর-ভাবে বলা আছে। পটাশকে তখনকার দিনে যবক্ষার বলা হতো, কারণ যবের শীষ পুড়িয়ে ঐ ক্ষার প্রস্তুত হতো। সেকালে সোডার নাম ছিল 'সর্জিকাক্ষার' যাকে আমরা বাংলায় সাজিমাটি বলি। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের স্থানে স্থানে জমির উপর এই সাজিমাটি চাদরের মত বা ছাতনা ধরার মত ফুটে উঠতে দেখা যায়। আজকাল বিলিতি সোডার আমদানী হওয়াতে এই সাজিমাটির ব্যবহার এদেশ থেকে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে।

(খনিজ ধাতুর ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিজ্ঞান যে কতদূর উন্নতি লাভ করেছিল, তার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় দিল্লীর কাছে যে পুরাতন লৌহ-স্তম্ভটি রয়েছে সেইটি দেখে। এই লৌহস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্ট পরবর্তী চতুর্থ শতকে অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। জলবাতাসের সংস্পর্শে লোহা জিনিসটায় অল্পদিনে মরিচা ধরে। কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে তৈরী এই লোহার থামটিতে আজও পর্যন্ত বিশেষ কিছু মরচে ধরতে পারেনি। এ অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার। এই লৌহস্তম্ভটি প্রায় ষাট ফুট উঁচু অর্থাৎ প্রায় একখানা পাঁচতলা বাড়ী ছাড়িয়ে উঠেছে। এতবড় একটা লোহার থাম বর্তমান জগতের কোন সর্বশ্রেষ্ঠ লোহার কারখানাতেও তৈয়ার করা সহজ নয়। এ থেকে প্রমাণ হয়, প্রাচীন ভারতের ধাতুবিদেরা ধাতুনির্মাণে ও ধাতুরসায়নে বিশেষ পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন। সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকার ধাতু বৈজ্ঞানিকেরা মরিচা বিরোধী ইস্পাত প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেছেন বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতে দেড় হাজার বছর পূর্বে ও জিনিস তৈরী হয়েছে।

পুরীর কাছে প্রাচীন কণারক সূর্যমন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ আছে সেখানেও এইরকম মরিচা বিরোধী লৌহে প্রস্তুত অনেকগুলি বিশাল কড়ি পড়ে আছে। লোহার তৈরী একটি বিরাট ছাতাও এই মন্দিরের কাছে পড়ে আছে, যাতে আজও কোন মরিচা ধরে নি। দেখে মনে হয় যেন এইমাত্র কারখানা থেকে নূতন তৈরী হয়ে এসেছে। লোহার সঙ্গে অন্য কোন্ কোন্ ধাতু কি পরিমাণে মেশালে

লোহাতে মরচে ধরতে পারে না প্রাচীন ভারতের ধতুবিদেরা দু'হাজার বছর আগে সেই রাসায়নিক প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন।

সুখের বিষয় যে, কিছুদিন থেকে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চার দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হয়েছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেউ কেউ জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজেরও সম্মানলাভ করতে পেরেছেন ; এ যে মস্ত শুভলক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই টুকুই সব বলে বসে থাকলে চলবে না। যতদিন না এদেশের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন হচ্ছে, ততদিন আমাদের দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য ও পরাধীনতা ঘুচবে না। তোমরা বাংলাদেশের ছেলেমেয়ে তোমরাই এদেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসা, আশা করি তোমরা উত্তর জীবনে এই মহৎ কার্যে ব্রতী হবে। তোমাদের শিক্ষা সাধনা ও উন্নতির প্রচেষ্টা যেন সার্থক ও সফল হয় এই আমার আশীর্বাদ।*

* সোনার কাঠি : নরেন্দ্রদেব ও রাধারাণী দেব সম্পাদিত।

১১

বিদেশে বাঙালী বৈজ্ঞানিকের আদর

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, যখন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চা ও মধ্যয়নার্থ অবস্থিতি করিতাম, তখন আমার মনে নিরন্তর এই চিন্তা উদিত হইত যে, ইউরোপে সেই কোপারনিকস, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রভৃতির সময় হইতে বিজ্ঞানে নবযুগের অবতারণা হইয়াছে, আর ভারত কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে। আবার ঠিক সেই সময় বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকায় দেখিতাম, জাপানবাসীরা মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ভারত আজ কত পশ্চাতে! আমি প্রায়ই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতাম, এবং এই বলিয়া নীরবে অনেক সময় অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি, হায়, এমন দিন আমাদের কবে আসিবে, যখন ভারতবাসীরা—কেবল পরান্নভোজী হইয়া থাকিবে না, তাহারাও নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ২৫ বৎসর যাবৎ কাল আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু আচার্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু ও আমি ঈশ্বরের কৃপায় এই নূতন অধ্যায়ের উদ্ঘাটন করিতে কতদূর সক্ষম হইয়াছিলাম, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার এখনও সময় আসে নাই। ১৯১০ হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই ৪।৫ বৎসর আর এক নূতন যুগের আরম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৯০১ সালে বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মৌলিক গবেষণার জন্য প্রথম বৃত্তি প্রদত্ত হয়। পর পর শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমান পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি আমার সহিত মিলিত হইয়া ছাত্ররূপে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন ও লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির মুখপত্রে তাঁহাদের প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু পূর্ব কথিত ১৯১০ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর। এই সময় শ্রীমান রসিকলাল দত্ত ও শ্রীমান নীলরতন ধর মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়া বিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

শ্রীমান নীলরতন যখন এম্‌. এস্‌.-সি-র জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তিনি হিন্দু হোষ্টেলে বাস করিতেন। সেই সময় তাঁহার পক্ষপুটে 'জ্ঞানদ্বয়' (শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ও শ্রীমান মেঘনাদ সাহা অবস্থিতি করিতেন। নীলরতন যদিও মাত্র দুই বৎসরের অগ্রণী, কিন্তু ইঁহারা তিনজন নীলরতনকে জ্যেষ্ঠের মত দেখিতেন। আমিও ইহাদের গুণে এতদূর মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, সর্বদাই হোষ্টেলে যাইয়া ইঁহাদের সহিত মেলামেশা করিতাম। ইঁহারা যে আমার শিষ্য তাহা ভুলিয়া যাইতাম, ইঁহাদের সঙ্গ পরম সুখদায়ক ছিল। শ্রীমান নীলরতন এম, এস্-সি-র পরীক্ষার জন্য যে স্বাধীন গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ দাখিল করিলেন, তাতেও যে তিনি পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিলেন কেবল তাহা নয়, তাহা আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হইল এবং বিজ্ঞান জগতে তিনি অচিরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। শ্রীমান নীলরতন এই সময় সরকারী বৃত্তি লইয়া বিলাতে গেলেন এবং পর পর লণ্ডন ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় স্থানেই তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

১৯১৬ সালে স্যার তারক নাথ পণ্ডিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের দেশ হিতৈষণা ও বদান্যতায় বিজ্ঞান কলেজ যখন প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ-লেখককে রসায়ন বিভাগের ভার লইতে আহ্বান করেন। সেই সঙ্গে 'জ্ঞান দ্বয়' ও মেঘনাদ সহকারী অধ্যাপকের পদে বৃত হইয়া কলেজে যোগ-দান করিলেন।

'কেন' ও 'কি প্রকারে,' এই প্রশ্ন সহস্র বৎসর ধরিয়া স্বতঃই সমাধানের জন্য মানবহৃদয়ে জাগরূক হইয়া আসিতেছে ; ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, উদ্দালক আরুণি একটু লবণ জলে গুলিয়া তাহার বিশেষত্ব থাকে কিনা, জলের প্রত্যেক পর-মাণুতে লবণের পরমাণুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় কিনা, এই প্রশ্ন তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু হাজার বৎসর ধরিয়া এই লবণের পরমাণু-সংহতি জলে কি ভাবে অবস্থান করে, তাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরহেনিয়স, অষ্টোআল্ড, প্রমুখ মনীষিগণ এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। জলে লবণের পরমাণু-সংহতি যখন গলিয়া যায়, তখন ইহার উপাদান সোডিয়াম ও ক্লোরিনের পরমাণু যথাক্রমে সংযোগ তড়িৎযুক্ত ও বিয়োগ তড়িৎযুক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। গত ৪০ বৎসর যাবৎ এই সিদ্ধান্তকে ভিত্তিস্বরূপ লইয়া একটি পরীক্ষামূলক শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক বিজ্ঞ রাসায়নিক বহু গবেষণা করা সত্ত্বেও এই বিষয়ে কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চারি বৎসর হইল, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া একটি তত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন। এই জটিল তত্ত্ব যুগপৎ গণিত-শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ লণ্ডন কেমিক্যাল

সোসাইটিতে প্রচারিত হইবা মাত্র তিনি যশস্বী হন। অতঃপর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পর পর কয়েকটি গবেষণা দ্বারা রসায়ন শাস্ত্রের একটি অজ্ঞেয় তমসাবৃত অধ্যায় আলোকিত করেন।

ঘোষের নিয়ম ('Ghosh's Law') বৈজ্ঞানিক জগতে কিরূপ আদর লাভ করিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে। গত এপ্রিল মাসে ডাঃ মেঘনাদ সাহা লণ্ডনে ছয় মাস অবস্থিতি করিয়া বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গমন করেন। সেখানে বিজ্ঞান মন্দিরে যাইবামাত্র অধ্যাপক নারন্‌সট্ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ডক্টর গক্‌কে চেনেন ?" মেঘনাদ একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, আমিতো এনাম কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না।" নারন্‌সট্ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সেকি! ডক্টর গক্ আপনার স্বদেশী ; আমরা সম্প্রতি ফিজিক্যাল সোসাইটির একটি বৈঠক আহ্বান করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিকের আসরে গকের নিয়ম আলোচনা করিয়াছি। মেঘনাদ তখন সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, মাপ করুন, আমি এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই, আপনি জার্মান ভাষায় যাহা গক্ বলিয়া উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা তাহাকে 'ঘোষ' বলি ; ডক্টর ঘোষ বরাবর আমার সহাধ্যায়ী ও সুহৃৎ।" নারন্‌সট্ তখন আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ঘোষ যুগান্তর সংঘটনকারী গবেষণার সূচনা করিয়াছেন।"

এখানে এই জার্মান বৈজ্ঞানিকের পরিচায়ক দুই একটি কথা বলা দরকার হইতে পারে। পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের গণিতমূলক ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি আজকালকার শ্রেষ্ঠতম গুরু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি এ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্বত্রই ঐ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া গৃহীত হইতেছে। সম্প্রতি এই পুস্তকের নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে তাহাতে "ঘোষের নিয়ম" বিস্তৃতভাবে আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে। একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ সকলে এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সফল হই নাই ; এতদিন পরে ডক্টর ঘোষ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা বড়ই সমীচীন, এবং এই জটিল তত্ত্বের সুন্দর মীমাংসা হইয়াছে।"

শ্রীমান জ্ঞান যখন বার্লিনে যান, তখন নারন্‌সট্ তাঁহাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, আপনি যদি আর কিছু দিন এখানে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমরা "অতিরিক্ত" অধ্যাপক বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু এই সময় শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

এখন শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। ইনি ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রীর অন্তর্ভূত কলইড্ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন এবং সম্প্রতি ডক্টর অব সায়েন্স-এর জন্য গবেষণামূলক যে সমস্ত প্রবন্ধ দাখিল করিয়াছেন, তাহা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হইয়াছে।

শিরিষ, শ্বেতসার, গঁদ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদিগকে যদি জলে দ্রবীভূত করা যায় এবং দ্রবীভূত এই সব দ্রব্য পার্চমেণ্ট কাগজে কিম্বা ভেড়ার পাকস্থলীর পাতলা চমড়ায় পোঁটলা বাঁধিয়া জলের মধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভিতরের দ্রব্য জলের মধ্যে কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না ; কিন্তু লবণ বা চিনি জলে গুলিয়া যদি এই ভাবে প্রলম্বিত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, সেগুলি আস্তে আস্তে বাহিরে জলের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, পরন্তু জলও পোটলার ভিতর প্রবেশ করিয়া ঐ সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন যদি লবণ ও গঁদ একসঙ্গে জলে গুলিয়া ঐরূপ ভাবে রাখা যায় তো লবণ গঁদ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। ভাতের ফেনকে গলিত শ্বেতসার বলিলেই চলে। এই সমস্ত দ্রব্যকে শিরিষ জাতীয় (**Colloids**) বলা হয়। আমাদের আহার্য পদার্থের অধিকাংশ এই শ্রেণীভূক্ত। পাকস্থলীতে খাদ্য-দ্রব্য কি প্রকারে পরিপাক হয়, তাহা শারীরতত্ত্বঘটিত বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। গত ২৫ বৎসর যাবৎ ইহা রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি নূতন শাখা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং এম. এস্‌-সি পরীক্ষার জন্য ইহাই বিষয়ীভূত করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন। পরীক্ষায় শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র প্রথম স্থান ও শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইঁহারা উভয়েই একসঙ্গে বিলাত গমন করেন এবং আরব্ধ কার্য সম্বন্ধে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটী কলেজে আরও নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েন। গত অক্টোবর মাসে লণ্ডনে কলইড্‌স্ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এক বৈঠক বসে। ইউরোপের যত রাসায়নিক এই বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়েন বা প্রবন্ধ পাঠান। জ্ঞানও তাঁহার প্রবন্ধে একটি নূতন 'নিয়ম' (law) উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রবন্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত অসটোয়াল্ড তাঁহার মাতৃভাষায় এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন।

শ্রীমান মেঘনাদের বিষয় কিছু লিখিতে আমার বাধ বাধ ঠেকে। যদিও ইনি বি. এস-সি. অধ্যয়ন কালে জ্ঞানদ্বয়ের সহপাঠী ছিলেন, কিন্তু গণিত শাস্ত্র ইঁহার প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র। গণিতশাস্ত্রমূলক পদার্থবিদ্যায় মৌলিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস্‌-সি. উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইনি গত বৎসর লণ্ডনে যান। সেখানে কিছুকাল গবেষণা করিয়া সম্প্রতি জার্মানীতে গিয়াছেন। ইনি হাল নাগাদ প্রায় বিশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া সম্প্রতি লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটিতে এষ্ট্রোফিজিক্স্ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন তাহা মুদ্রিত হইয়া আমার হস্ত-গত হইয়াছে। ইহাতে গ্রহ-নক্ষত্রাদিগের উপাদান ঘটিত অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা (**Relativity**) তত্ত্ব

পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া ইঁনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার প্রতিভার পরিচয় এক নিঃশ্বয়াসে দেওয়া যান না। physica নামক পত্রিকার অধ্যাপক গ্রূট এই বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন, "গূঢ়তর উদ্ঘাটন বিষয়ে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া জয়মাল্যের তিনিই অধিকারী হইয়াছেন।"

ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমারফেলড্ পদার্থবিদ্যার আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি মেঘনাদের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, মেঘনাদকে তাঁহার গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ছাত্রাবস্থা হইতেই মেঘনাদ জার্মান ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গণিত ও জ্যোতিষ্কমূলক পদার্থবিদ্যায় মেঘনাদের সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ আছেন কিনা, আমি জানি না।

শ্রীমান নীলরতন, "জ্ঞানদ্বয়" ও মেঘনাদ প্রভৃতি যে সমস্ত মৌলিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহার সমস্তই প্রেসিডেন্সী কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অনুষ্ঠিত। এতদিন একটা অন্ধ সংস্কার ছিল যে, বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার হাওয়ায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা জন্মায় না! কিন্তু ইঁহারা কয়জন আমাদের দেশের যুবকবর্গের নিকট একটা আদর্শ উপস্থাপিত করিতেছেন। মেঘনাদ ও জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. এস্-সি. উপাধি উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা যতগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভগ্নাংশ মাত্র দাখিল করিলেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্-সি. উপাধি পাইতেন, কিন্তু ইঁহারা মনে করেন যে, তাহাতে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির অবমাননা করা হয়।

বাঙ্গালাদেশে প্রতিভাশালী যুবকের অভাব নাই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ইঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উচ্চ উপাধি বা ছাপ পাইলেই বিদ্যার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। একটি চাকরি লইয়া পলাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়েন; পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে যে, আমাদেরও কিছু দিবার আছে, তাহা ভুলিয়া যান। ভুলিয়া যান যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী উদ্ঘাটন করিয়াও শেষ জীবনে বলিয়াছিলেন—"আমি বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ডের সঙ্কলন করিতেছি। জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" আমরা বত্রিশকোটী ভারতবাসী, ইহার মধ্যে ত্রিশ জনও মৌলিক গবেষণায় বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

"সর্বত্র জয়মন্বিষ্যেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।" হয়ত আমার জীবনে আমার এই ইচ্ছার সফলতার দিন আসিয়াছে। বঙ্গজননী যাহাতে এইরূপ রত্নপ্রসবিনী হন, ইহাই আমি জগদীশ্বরের নিকট কামনা করি।*

* প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩২৮

১২

জাতীয় সম্পদের মূলে বিজ্ঞানের শক্তি

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বিজ্ঞান সাধনার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা আজ পৃথিবী জয় করিয়াছে। শিল্পে, বাণিজ্যে, অর্থে, স্বাস্থ্যে ও দুর্জয় ক্ষমতায় জগতের মধ্যে তাহারা আজ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিজ্ঞান অনুশীলনে, একাগ্র সাধনা করিয়া তাহারা যেরূপ দ্রুত ও আশ্চর্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়। আমাদের এই দরিদ্র দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে, জাতীয় শক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞানের সাধনা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন। আজ যে ইউরোপ ও আমেরিকা জাতি হিসাবে সকল দিক দিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে বিজ্ঞান সাধনাই তাহার মূলে। বিজ্ঞান চর্চার ফলেই আজ আকাশের বিদ্যুৎ তাহাদের আজ্ঞাবাহিনী দাসী। জলপ্রপাতের গতি, নদ-নদীর তরঙ্গবেগ, সূর্য-রশ্মির উত্তাপ, আজ তাহাদের পদানত ভৃত্য। তাহারা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সাহায্যে দূর দূরান্তরের লোকের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছে। বেতার বার্তার সাহায্যে অগাধ সমুদ্রে ভাসমান তরীর সঙ্গে প্রতিক্ষণে যোগ রাখা সম্ভব হইয়াছে। উড়োজাহাজে তাহারা দেশ দেশান্তরে ছয় মাসের পরিবর্তে আজ ছয়দিনে উত্তীর্ণ হইতেছে। রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতি বিস্ময়কর ও অদ্ভুত আবিষ্কারের দ্বারা আজ পৃথিবীর লোকের বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। বিজ্ঞান আজ ও-দেশের মানুষকে পৌরাণিক ঋষি বা তপস্বী বা দেবতাদের ন্যায় প্রভূত শক্তি ও সম্পদের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে।

জাপান আজ ইউরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞান সাধনার বলে কত অল্পদিনের মধ্যেই না এশিয়া মহাদেশের সকল জাতি অপেক্ষা সকল দিক দিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন চীনও বিজ্ঞানের শিক্ষায় দীক্ষালাভ করার ফলে জগতে অজেয় হইয়া উঠিবে। জাপানকে ইউরোপ ও আমেরিকা আজ সম্মান ও সম্ভ্রম দেখাইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর সম্মান কোথাও

নাই। ইউরোপ আমেরিকা ত দূরের কথা, তাহারা আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইনেও সকলের অবজ্ঞার পাত্র। ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে মানুষের মত বাঁচিতে হইলে আমাদের সকলকে বিজ্ঞান সাধনায় একাগ্রমনে ব্রতী হইতে হইবে। যতদিন না এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন হইতেছে, ততদিন আমাদের দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্য ও পরাধীনতা ঘুচিবে না।

দেশের ছেলেমেয়েরাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল। তাহাদের মধ্যে যেমন স্বদেশানুরাগ উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, সেইরূপ বিজ্ঞান সাধনায় অনুরাগী হইয়া উত্তর-জীবনে যাহাতে তাহারা এই মহৎ কার্যে ব্রতী হয়, এখন হইতে তাহাদের সেইরূপ শিক্ষার দ্বারা মনোবৃত্তি গঠন করা আবশ্যক।

আজকাল দেখিতে পাই—'পুরাকালে আমাদের দেশে সমস্তই ছিল, ইউরোপ ও আমেরিকা এখনও সেখানে পৌঁছাইতে পারে নাই'—এই বলিয়া অনেকেই ছেলেদের নিকট গর্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু একথা কেহই তাহাদের বলেন না যে, ভারতবাসী তাহাদের সেই প্রাচীন সাধনা হইতে বিরত হওয়ার ফলেই তাহাদের আজ দুর্দশার অন্ত নাই। উচ্চ শিক্ষার নামে কেবল কতকগুলি বড় বড় বই মুখস্থ করিয়া এদেশের ছেলেরা বেকার অবস্থায় ঘরে বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছে। পূর্বপুরুষদের অধুনাবিলুপ্ত বাহাদুরীর বড়াই করিয়া আর বেদ-বেদান্ত উপনিষদের দোহাই পাড়িয়া জাতির দুঃখ ঘুচিবে না, দারিদ্র্যও দূর হইবে না। নিজেদের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকিবার জন্য একালে তাহারা কেবল মুখে বড় বড় কথা বলিতেছে, কিন্তু প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে কেহই অগ্রসর হইতেছে না। দুঃখে, রোগে, অনাহারে, দাসত্বের নিষ্পেষণে জর্জরিত হইয়া তাহারা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র জীবন ও ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টায় পরস্পর বিরোধ ও আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক বিজ্ঞানের সাধনায় যতদিন না তাহারা নিজেদের মিলিত শক্তি নিয়োগ করিতে শিখিবে ততদিন দেশের ও জাতির উন্নতির কোন আশা নাই।

আধুনিক বিজ্ঞান জগতে ইউরোপ ও আমেরিকা এমন কি জাপানও অগ্রণী হইয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহারা আজ শ্রেষ্ঠ ধনী ও প্রতাপশালী জাতি হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ও নিত্য-ব্যবহারেও অসংখ্য জিনিসপত্র, ঔষধ ও প্রসাধনসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান শিল্প বাণিজ্য ও বিজ্ঞানবিহীন দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করিতেছে। ভারতবর্ষ তাহাদের একটি মস্ত বড় ক্রেতা। এদেশের বাজার বিদেশী জিনিসে ভরিয়া গিয়াছে। আমরা নির্বিচারে সেই সমস্ত কিনি, ফলে আমাদের কষ্টার্জিত পয়সা অবাধে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা যতই ধনী হইয়া উঠিতেছে, আমরা ততই দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি।

মাত্র ষাট সত্তর বৎসরের মধ্যেই জাপান যে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে

পরিণত হইতে পারিয়াছে, সে কেবল বিজ্ঞান অনুশীলনের গুণেই ; জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-উপশাখায় জাপান যে কত রকমেই উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার সম্যক্ আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র ফলিত বিজ্ঞানের দুই একটি স্থূল উদাহরণ দিলেই তাহা অনেকটা উপলব্ধি হইতে পারে। আজ জাপান আমাদের এই ভারতবর্ষ হইতেই প্রচুর ফেলা-ছড়ানো অকেজো লোহার টুকরো, কুচো লোহা, কাঁচা লোহা ও পিগ্ আয়রণ অত্যন্ত সস্তা দরে কিনিয়া লইয়া তাহা হইতে মজবুদ পাকা লোহা ও ইস্পাত তৈয়ারী করিতেছে। সেই ইস্পাত হইতে বিবিধ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, অস্ত্রশস্ত্র, কামান, বন্দুক, রণতরী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নিজেরা ব্যবহার করিতেছে ও দেশ বিদেশে বিক্রয় করিয়া রাশিরাশি অর্থ উপার্জন করিতেছে ; জাপান খেলনা, পুতুল, বাইসিকেল, বিবিধ ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিয়া শুধু যে নিজেদের অভাবই পূরণ করিতেছে তাহাই নহে, দেশ-বিদেশে চালান দিয়া পৃথিবীর বাজার হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে।

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিল রাজা রামমোহন রায়ের আমল হইতে ; অর্থাৎ জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষালাভ করিবার সত্তর বৎসর পূর্বে। কিন্তু ভারতবর্ষ ইউরোপের সাহিত্য লইয়া ভুলিয়া রহিল ; জাপান বাছিয়া লইল—বিজ্ঞান। ফলে সত্তর বৎসরের মধ্যে জাপানে হইল নবীন সূর্যোদয়, কিন্তু দেড়শত বৎসরেও ভারতবর্ষ 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' রহিয়া গেল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালীর ছেলেই বিজ্ঞান পড়ে তোতা-পাখীর মত মুখস্থ করিয়া, কেবলমাত্র পরীক্ষায় পাশ করিবার উদ্দেশ্যে। গত তিরিশ বৎসরের মধ্যে কত হাজার ছেলে আই. এস-সি., বি. এস- সি., এম এস্-সি. পাশ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন ছেলে পরবর্তী কালে বিজ্ঞান সাধনাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছে ?

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, অর্থের অভাবেই বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। কিন্তু একথা সত্য নয়। কত অশিক্ষিত, কপর্দক শূন্য মাড়োয়ারী, বিহারী, পাঞ্জাবী এ দেশে আসিয়া দিনান্তে মাত্র একমুষ্টি ছাতু খাইয়া, কত কষ্ট স্বীকার করিয়া ক্রমে বড় বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। এদেশের ছেলেদের চাই ব্যবসায়ে সেই আগ্রহ, যাহা সকল কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিবার ও জয়ী হইবার শক্তি দিতে পারে। সুখের বিষয় যে, চাকরির অভাবে কোনো কোনো ছেলের মতিগতি আজকাল ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়াছে। দেশের লোকের উচিত তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া দেশীয় পণ্য গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করা। বিদেশী দ্রব্যের তুলনায় নিকৃষ্ট হইলেও, বিলাসিতা ব্যাপারে ত্যাগ স্বীকার করিয়া দেশের বৃহৎ কল্যাণের মুখ চাহিয়া দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ ও পোশকতা দান করা কর্তব্য। নচেৎ কোন দিনই আমাদের শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে না, এবং আমাদের দুঃখও দূর হইবে না। বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে বাবুগিরি করিতে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।*

*পাঠশালা—১ম বর্ষ (১৩৪৫), ৮ম সংখ্যা।

১৩

শিক্ষার আমূল সংস্কার

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সহশিক্ষকবৃন্দ,—

আজকের আপনাদের এই সভায় আমি ইউরোপ জার্মেনিতে কি হয় সে কথা বলতে আসিনি—সে সব শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। লর্ড হার্ডিঞ্জ কি কি করলেন—তাও শুনতে চাই না; তাঁরা অনেক কাজ করেন। সে দিন গভর্নর সাহেব ঢাকায় ৯ লাখ টাকা দিয়ে এলেন—**New Moslem Hall**-এর জন্য। একজন শিক্ষক আমায় বললেন—এ ব্যয় কেন? কেবল চুণ সুরকিতে এত ব্যয়! আমার মুসলমান ভ্রাতাগণ কি বলবেন জানি না—এ টাকাটা ত মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রাইমারী শিক্ষায় ব্যয় করলেও চলত। মুসলমানদের কত উপকার হতো।

কথা এই—আমি এই কলকাতায় প্রায় ৬১ বছর আমি। এখন এই যেখানে বক্তৃতা করছি—তখন এসব জায়গায় কি ছিল? হেয়ার সাহেবের বাড়ী, ভর্তি হলুম যখন এক তলা বাড়ী—নতুন স্কুল তৈরী হয়েছে। একটা অদ্ভুত এই যে তখন যে সব ছাত্ররা ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর স্কলারশিপ নিয়ে আসত—তারা সব বিষয় পড়ে আসত। এখনকার ম্যাট্রিক ছেলের চেয়ে সব বিষয়ে বেশী জানত—কেবল ইংরাজী ছাড়া। ইতিহাস ভূগোল সব শেষ, পাটিগণিত সব শেষ, জ্যামিতিও সব—কেবল ইংরাজী ভালো জানতো না। ৪ বছর ইংরাজী ঠেলে ঠেলে পড়ান হতো—কেন? না কেউ উকিল হবে—ব্যারিষ্টার হবে। আজকাল ইংরাজীর মোহ আরও বেড়ে গেছে—সবাই ইংরাজী পড়ে ব্যারিষ্টার হতে চায়। আমার যখন ৮।৯ বছর বয়স—প্যারিচরণ সরকারের থার্ডবুক শেষ করেচি—**Leny's Grammar** পড়তুম—কিছুই বুঝতুম না, সব মুখস্থ করতুম। তার প্রথম definition এখনও মুখস্থ আছে—**English Grammar is the art of reading & writing English language.** একথা একশ বার আবৃত্তি

করতাম—কিছুই বুঝতাম না। আজ বুঝিচ—**living language**—একটা জ্যান্ত ভাষা শিক্ষায় কোনও ব্যাকরণ প্রয়োজন নেই—খালি কান থাকলেই যথেষ্ট। সেদিন Andrew Carnegie-র autobiography পড়ছিলুম—তিনি Scotch কিন্তু **American citizen**—শিক্ষার জন্য যখন ১০০ কোটি টাকা দান করেছেন, সেই সময় **Herber Spencer**-কে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে গল্প করছেন—তাঁর ১০।১২ বছরের ভাইপো চুপি চুপি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল এবং জিজ্ঞাসা করলে—**Is it not that great man who says that Grammar is not a necessary subject? Grammar** দিয়ে বিভীষিকা দেখাবার দরকার নেই। আমাদের দেশের ছেলেদের কাছে **Grammar** একটা বিভীষিকা—অথচ আমরা **shall, will**-এর **difference** নিয়ে কত সময়ই না নষ্ট করি! **I will be drowned and nobody shall help it** ইত্যাদি। আমি একদিন **China** সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলাম, এমন সময় আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু হেরম্ব বাবু (**City College**-এর **Principal**) এলেন। তাঁর **Weak Point** আমি জানি—একটা মজা করলুম; তিনি ত হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তারপর **Webster** খুলে দেখলেন—লিখচে কখন কখন 'to' ও হয়। মাদ্রাজের একজন গভর্নর 'Marjori banks' এমন উচ্চারণ করতেন যে **David Hare**-এর মত কোন ইংরেজ শুনলে হতভম্ব হয়ে যেতেন। **Plymouth**—প্লিমোথও বলে আবার প্লিমাউথও বলে; bow, ধনুক 'বো'ও হয় আবার 'বাউ'ও হয়। কিন্তু কেউ যদি বলেন **I have to make a profound bow** (বো)—তা হলে বোধ হয় অনেকের হিষ্টিরিয়া হবে। ইংরাজী বিদেশী ভাষা—আচ্ছা, এ যদি ঠিকমত উচ্চারণ করতে না-ই পারি, তা হলে কি ফাঁসি যেতে হবে? আমার একজন প্রিয় ছাত্র ইংলণ্ড থেকে **Science**-এ বিশেষ পারদর্শী হয়ে ফিরেছেন—**London D. Sc.** কিন্তু তিনি **Indictment**-এর উচ্চারণ অন্যভাবে করেন। তাতে হাসবার কি আছে? আমি বলি, এ সব বৃথা কালক্ষেপ। ইংরাজীতে **Prosody**র-কত কি নিয়ম—**Foreign Government** বলে কি সেই সবই ইংরেজের মত শিখতে হবে? এখন এই বিদেশী ভাষা দিয়ে ছেলেরা যা শেখে, মাতৃভাষা বাহন হলে এর ১০ গুণ বেশী শিখতে পারে। **Lord Ronaldshay** তাঁর 'Heart of Aryavarta'তে ঠিক এই কথাই বলেছেন—'**Appalling waste of time**'। **Greaves Committee** হলো—মাতৃভাষা বাহন হবে। কিন্তু এখন দেখি যে তিমিরে সেই তিমিরে। **Government** ত' সব বিষয়েই **Pigeon-hole**-এর মত চাবি দিয়ে রেখেছেন—কিন্তু তাঁদেরই বা দোষ কি? সবাই ইংরাজীওয়ালা হতে চায়। একবার **Duff College**-এ একটা সভা হয়, তাতে কিশোরী মোহন ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করলেন সেই সভায় **Governor General Lord Hardinge**-কে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল। সেটা ছিল **Pre-University days**...তখনও ইংরাজী পড়াবার

কোন সুবিধাই হয়নি, কিন্তু সেই সভাতেও ইংরেজী পড়াওয়ালারা চাকরির জন্য হাঁক ডাক ছাড়ছিলেন। তখন সবে ত' ইংরাজীর চাল্‌ হচ্ছে···W. C. Bonnerjee তখন সবে ইংরেজীর বোল্‌ চাল শিখছেন···বসতে, কাশতে, হাসতে, হাঁচ্‌তে তিনি ইংরাজী বোল ছাড়তেন ; একজন জিজ্ঞাসা করেছিল,···আচ্ছা যদি উহাকে ধরে খুব প্রহার দেওয়া যায়, তবে ইনি 'বাবারে, মারে' বলবেন না father mother বল্‌বেন। এই ইংরাজীর মোহ ! আমরা যখন ছেলেবেলায় এই জায়গায় Albert স্কুলে পড়েছি···কেশববাবুর বক্তৃতা শুনেছি, কিছু পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসরে নামলেন, A. M. Bose বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন তখন একেবারে Young Bengal went mad ; আর তখন এই Albert Hall-এর সভাতেও বলেচি আর তিন বছর আগে Behar University ছাত্রদের Saron Conference-এও সভাপতিরূপেও সেই কথা বলে এলাম "If you give me any compliment for my correct pronunciation .of my speech I shall hang down my head in shame এইটেই ত' Slave mentality। স্বাধীন দেশের লোকেরা কখনও পরের ভাষায় এত কথা বলে না ; French man ইংরাজী জানলেও বল্‌বে না। Dryden-এর কবিতায় একবার মাত্র একটি French কথা পাই। Robert Southey ১০০ বছর আগে বলেছেন তখন ইংরাজদের বড় বড় Dinner-এ menu French ভাষায় লেখা হত, এখনও সে মোহ একেবারে কাটেনি, তিনি লিখেছেন "Ours is a noble language and he who uses a foreign word where an English word can do it, is guilty of a grievous offence against mother country." Macaulay-র মতই এই। আমাদের সাহিত্য অবশ্য এমন পুরু হয়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ইংরাজীর ছাপ যথেষ্টই ছিল, আর সাহিত্য সম্রাট রবীন্দ্রনাথও 'উলঙ্গ বাস্তব' (naked reality) লেখেন। আজকালও information that counts not the language। ইংরাজীতে বলে He is a very well informed man আর আমাদের যত B A., M.A. কোন informationই রাখেন না, কতবার বলেছি স্যার আশুতোষ cheap degree করা অবধি এখনকার B.A., M.A. গুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে clock to hide one's ignorance. আমার বড় দাদা বল্‌তেন, পাসায়ে অধ্যয়নং। একদিন মেদিনীপুর থেকে আসছি, খড়্গপুরে অনেকগুলি ছাত্র উঠলো ; আমায় চেনে না—দেখি সকলেরই বই চামড়া দিয়ে বাঁধা বেশ ঝকঝকে। খুলে দেখলাম "one day preparation series," "24 hours' road to success" এই সব। তাও লাল নীল পেনসিলে দাগ দিয়ে চিত্র বিচিত্র করা Imp, V. Imp আবার তাতেও হলো না, V.V. Imp। আমিও অনেক স্কুলের সঙ্গে জড়িত—কটা স্কুলের যে আমি President তা আমি নিজেই জানি না। Guardian-রা complain করেন "বাজে পড়ানো অনেক

হচ্ছে” ছেলেরাও তাই। বলে কি না “বেশী কেন পড়বো? ও তো আর পরীক্ষায় পড়বে না”। আমার এক বন্ধু আছেন—তিনি সকলের পরিচিত বলে তার নাম করবো না—তাঁর একটি ছেলে ছিল। তার কাজই ছিল ফুটবলের ম্যাচ ও থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে বেড়ানো। একবার পরীক্ষার সময় বাপ্ বকলেন—সে বললে “আমি নিশ্চই পাশ হবো।” তারপর বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী গিয়ে নানা কলেজের Notes সংগ্রহ করে ঠিক পাশ হলো। যার বই কেনবার সঙ্গতি আছে, সেও পাতা কাটবে না। Universityতে যাঁরা যে subject পড়ান, তাঁরাই Examine করেন। ছেলেরা বেশ বোঝে কার Idiosyncrasy কোথায়। লেখা-পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এই খুঁজে বেড়ায়। English-এর M.A. কে যদি বলি Italian war of independence-এ কে কে hero? হয়ত Mazzini-র নাম শুনেছে, কিন্তু Garibaldi বা Cavour-কে তা কেউ বলতে পারবে না। French Revolution কেন হলো? “জানি না,” এত কম জানে তারা! তাই বড় দুঃখে বল্‌তে ইচ্ছে হয় যে University, তুমি কেন এদের একটা ছাপ দিয়ে দিচ্ছ? যেমন ষাঁড়কে দাগ করে দেয়। আজকাল রোজ সকালে আমি “বসুমতী” “আনন্দবাজার” পড়ি। সব খবর পাওয়া যায় যা ইংরাজী কাগজে আছে, তার কিছু বাদ নেই Free Press, Associated Press প্রভৃতি। তা ছাড়া “প্রাচ্য প্রতীচ্য” একটা স্তম্ভে দেশ দেশান্তরের অনেক বুদ্ধিগর্ভ সংবাদ থাকে। দুনিয়ার খবর ইংরাজী না জেনেও সব পাওয়া যায়। তারপর মাসিক পত্রিকা “প্রবাসী” আছে। আমি তা বলে ইংরাজীকে banish করে দিতে বলচি না, কিন্তু বাংলায় যে ৩০ হাজার ছেলে ইংরাজী পড়ে তাদের যদি জিজ্ঞাসা করি তোমাদের আদর্শ কি? সবাই বলবে I. C. S., অথচ বাংলা দেশে বড় জোর ১টা বা ২টা I. C. S. হয়। তার জন্য আবার যত সব ভালো ছেলে অস্থি চর্ম সার হয়ে যায়, হাড় মাংস বেরিয়ে যায়, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হয়। তা ছাড়া B. C. S. আছে তারপরে কেউ ডাক্তার, কেউ প্রফেসর, আর উকিলের ত' কথাই নেই। হাজার করা কজন এইরূপে absorbed হয়? আমি কতবার বলেছি, যে যদি একদিনের জন্যও আমি Vice-chancellor হই, তবে প্রথমেই Law College ভূমিসাৎ করে দিই। ভেবে দেখুন ত, এই যে, এত উকিল তৈরী হচ্ছে কত তার মধ্যে কিছুই উপায় করতে পারছে না। District court, Sub-Divisional court এসব জায়গায় অসংখ্য উকিল; এক আলিপুরেই ৮০০ উকিল 'most of them are rotting there' অথচ এখনও ২০৯৯ ছেলে Law পড়ছে। এখন একমাত্র উপায় দেখছি এই সব Law পড়ুয়া ছেলেদের জাহাজ বন্দী করে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে গিয়ে জাহাজের তলা ফুটো করে দিতে হয়। এরা কি জেনে শুনে Economic Suicide করচে না? These briefless lawyers, are they not committing suicide wilfully, intentionally? এইমাত্র সেনহাটির একটি ছেলের

সঙ্গে দেখা হল, বললাম, কি করছ? না ল' পড়চি। এতে যে কতটা শক্তি সামর্থ্যের অপচয় ঘটচে, তা আমি একবার আপনাদের ভেবে দেখতে বলি।

John Morley Extension Lecture-এ একবার বলেছিলেন—"There cannot be a greater misfortune than to be taught by a teacher whose mental horizon does not extend beyond his subject."—তা' হলেই হবে, সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। যে কোন Subjectই হোক—যিনি পড়াবেন তিনি যদি অসাধারণ পণ্ডিত হন, ত' তাঁর কাছে পড়ে কত আনন্দ হয়। আর আজকাল ত' যে ছেলে কাল M.A. পাশ হল, আজ সে কলেজের প্রফেসর বা স্কুলের মাষ্টার। সে পড়াবে কি—তা ত' আমি বুঝি না। এই যে ৩০ হাজার ছেলে Universityতে পড়ে—এর জায়গায় যদি মাত্র ৩ হাজার বাছা বাছা ছেলে পড়তো ত' যথেষ্ট। তার ভেতর থেকে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার কত হবে—হও না ; more than enough। আর শিক্ষককে যতটুকু পড়াতে হবে তার একশ গুণ—হাজার গুণ পড়তে হবে। এই জন্যই যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের ইংরাজী জানা দরকার। এই যে প্রায়ই একটা অভিযোগ শুনি যে ছেলের পড়ায় মন নেই—আমি বলি যে পড়াতে জানলে ছেলে নিশ্চয় মন দিয়ে শোনে। শিক্ষার বাহন যদি বাংলা হয়,—ধরুন যদি আমি কথকতা ধরনে দেশের ইতিহাস শিখাই, ছেলেরা নিশ্চয়ই মন দিয়ে শিখবে। ভারতবর্ষের ভাল ধারাবাহিক ইতিহাস ত' নেই-ই যা আছে তাতে আবার পাই সতের জন অশ্বারোহী সৈনিকের বাংলা জয়ের কথা। বঙ্কিমবাবু বলেন—এ অসম্ভব আজগুবি কথা। এখন অবশ্য তাম্রফলকে আমাদের প্রাচীন নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। যদি কথকতার মত করে ইতিহাসের গল্প বলা যায়—আর্য্য সভ্যতা, তারপর বৌদ্ধ যুগের কথা, গজনী এলেন, তারপর জয়চন্দ্র, পৃথ্বিরাজ, সংযুক্তার স্বয়ম্বর, রাজপুত কাহিনী, বাবর, সঙ্গ, আকবর, প্রতাপ—ইত্যাদি—আমি guarantee দিতে পারি ভারতের সমগ্র ইতিহাস চূড়ান্ত করে সপ্তাহে মাত্র ২ দিন নিয়ে ৩ মাসের মধ্যে শিখিয়ে দিতে পারি। এখন ইংরাজীতে ইতিহাস শেখানোর জন্য তার মানে করতে হয়, তার Grammar,—Syntax, Etymology—Rhetoric, Prosody ইত্যাদি সব শিখতে হয়। অথচ বাংলায় এই ঈশানবাবুর ইতিহাস কি সুন্দর! কালীপ্রসন্ন বাবুর রাজপুত কাহিনী অতি উপাদেয় বই। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হলে ম্যাট্রিকুলেশনের মধ্যে ১৬/১৭ বছর বয়সে এখনকার চেয়ে দশগুণ শিক্ষিতব্য বিষয় জানতে পারি।

তারপর আর এক কথা—এখন সকলেই চায় যে পরীক্ষা পাশ করতে হবে। কিছুদিন পূর্বে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, এসেই বললেন—আপনার উপর আমার claim আছে, ১৯০৩ সালে পড়েছি আপনার কাছে। আমি তখনই ধরে নিলাম—লোকটি নিশ্চই উকিল। ঠিক তাই—ব্যাপার কি? না, তাঁর ছেলে

৩য় বার—B. Sc. ফেল করেছে ; তিনি Re-examination-এর জন্য St. Xaviers College-এর Prefeet-এর দ্বারা দরখাস্ত করেছেন। তাঁর অনুরোধ আমি কিছু বলে দিই। ভাবলুম—হায়রে? বিধাতা কি কেবল স্বাস্থ্য নষ্ট করে examine পাশ করতেই বাঙালীকে সৃষ্টি করেছেন? সকলেরই taste আছে কোন না কোন বিষয়ে—যদি guardian গোড়া থেকে নজর রেখে ছেলেকে মানুষ করেন, তাহলে যে কত বেশী ফল পাওয়া যায় তা বুঝে দেখতে বলি। এই যে ইংরেজ জাতি—তারা কি করে? সকলেই ত' Graduate-হতে যায় না। Secondary stage পর্যন্ত পড়েই তারা নানা বিভাগে প্রবেশ করে। মাত্র শতকরা ১০/১৫ জন কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য ঢোকে। ৩/৪টি ছেলে থাকলে বাপ যেটি most Scholarly তাকে বেছে Universityতে পাঠায়। Well informed করে যে কোনও Profession-এ ঢোকালে কোন ক্ষতি হয় না। আর এখানে কি হয়? Universityতে গিয়ে নতুন একটা জাতির সৃষ্টি হয়েচে। ইলিশ মাছ কিনে দু আনা পয়সা মুটে ভাড়া দিয়ে ঘরে নিয়েযেতে হয়, তা না হলে I shall lose my caste. Guardian-রা complain করেন—University-তে কি হয়? অর্থকরী বিদ্যা শিখান হয় না। কিন্তু তাঁরা যদি যে ছাত্র মেধাবী তাকেই University-তে পাঠান তা হলে আজ বাঙালী কতদিকে যেতে পারে। Sir A. Chowdhuryও বলেছিলেন যে ছেলে সবচেয়ে মেধাবী তাকেই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের ধারণাই হয়েচে—"লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি গাড়ী ঘোড়া চড়ে কে?—মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওলা, পার্শী—বাঙালী ক'জন? ওরা জানে তাদের বেশ গচ্ছিত টাকা আছে, তারা ইংরাজী শিক্ষাকেই শেষ আদর্শ করেনি। আর বাঙালী ইংরাজী লেখাপড়া শিখে চাকুরী করচে, ছুটি হলে রাস্তায় ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরছে—কন্যাদায়, গৃহিণী, অন্ন নাস্তি। এর প্রতিকার—শিক্ষার আমূল পরিবর্তন চাই।

সেদিন জাপানের কথা পড়ছিলাম—তারা শিক্ষা দেয় মাতৃভাষায় ; ফলে জাপানে আজ এমন পরিবার নেই যেখানে লোক লেখাপড়া জানে না। D. P. I.-র Report পড়ছিলাম—প্রত্যেক ছেলের জন্য শিক্ষায় গড়ে ২৫০/৩০০ টাকা খরচ হয়। Middle class টাকা উপার্জন করে না—আমরা middle class—parasites, কোনও ব্যবসা করতে পারি না—নূতন অর্থ সৃষ্টির পন্থাও দেখাতে পারি না। বাংলা দেশ কৃষিপ্রধান—কৃষিজাত পাট ধান করে কারা? আজ এই ভাদ্রমাসে যে কৃষক কোমর জলে দাঁড়িয়ে পাট ধুচ্চে, আর ম্যালেরিয়ায় ভুগচে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উৎপাদন করচে তারাই, আর আমরা middle class এরই অপব্যবহার করে চালিয়ে যাচ্ছি। মজা এই যে, এই সব masses—যারা Wealty of the Country—এদের লেখাপড়া শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত

হয় না! এটা কি ভাববার কথা নয়? আজ যদি বাংলা ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা থাকতো, তা হলে এই সময়ের মধ্যে দশগুণ বেশী লেখাপড়ার প্রচার হত। কেবল Research-এর জন্য ৩000 হাজার ছেলেই যথেষ্ট হত। অথচ এত সত্ত্বেও আজকাল কৃতী সন্তান বেরুচ্ছে কই? কিছুদিন পূর্বে আমি রাজসাহীতে গিয়েছিলাম। ২০ বৎসর পূর্বে আর একবার যাই—তখন বলেছিলাম, রাজসাহীতে মাত্র ২/৩ জন কৃতী সন্তান আছেন—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রমাপ্রসাদ চন্দ। এবারেও গিয়ে দেখি তা ছাড়া আর কেউ নেই। বরেন্দ্র ভূমি—গৌরবের স্থল; দিঘাপতিয়া, নাটোর, অনেক টাকা শিক্ষায় ব্যয় করেছেন। স্কুল আছে, কলেজ আছে, লেখাপড়ার এত চর্চা, কিন্তু ঐ তিন জনের মত এমন আর একজনও কই? আমি বলি—It is dearth of intellect. আমাদের ছেলেরা সব note note করে পাগল —ঢোক গিলিয়ে গিলিয়ে তাদের সর্বনাশ করা হচ্চে। তাই বলি, যে শিক্ষক—তা বড়ই হন বা ছোটই হন, সবই এক জাত—যিনিই note dictate করবেন, I will have him courtmarshalled. Spoonfeeding এখনকার ধারা—এতে তারা আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আমার কাছেও কতগুলি ছেলে থাকে - দেখি, দিনরাত পড়ছে। বলি দুই তিন ঘণ্টার বেশী পড়িস্ কি করে? শিক্ষা নয়—কোনও রকম পরীক্ষার দিন গলায় আঙ্গুল দিয়ে উগ্‌রে দিয়ে আসা চাই। পরলোকগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একটা গল্প বলতেন—একটা ছাত্রের নিকট একখানা খুব ভাল বই ছিল। Selfculture—তার নিকট চাইতে সে বললো যে, ওখানা আমি বিষবৎ পরিত্যাগ করেচি—পরীক্ষার পর থেকে ওখানকার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই। আমি বলি, লেখাপড়ায় আনন্দ যদি না পাওয়া যায় ত' সে লেখাপড়া মিথ্যা। কলকাতায় আর একটা রোগ হয়েছে ছেলেদের Private tutor রাখাও একটা fashion হয়ে দাঁড়িয়েছে। এও একটা vicious system। ছেলে ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত খাঁচায় বদ্ধ থেকে পড়ে এলো, বাড়ীতে জল খাচ্ছে—ঝি এসে খবর দিল "মাষ্টারবাবু এসেছে" কোথায় তখন লাফাবে, খেলবে—তা নয়, আবার মাষ্টার। তাও একজন নয়—ইংরেজীর মাষ্টার, Mathematics-এর মাষ্টার, সংস্কৃতের মাষ্টার ইত্যাদি। ইংরাজী পড়তে আমি বারণ করি না—ইংরাজী শিক্ষার against-এ আমি নই—কেননা একটা পাশ্চাত্য ভাষা জানা দরকার, বিশেষ করে রাজভাষা। রাজ-পুরুষরা ভাবে—বুঝি আমাদের Prestige কমে যাবে—কোন ভয় নেই, যতদিন Shakespeare আছে, এই ভাষা যাবে না। জাপানীরাও ইংরাজী পড়ে, কিন্তু Science পড়বার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু। লণ্ডনে অনেক বড় বড় জাপানীদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে—তারা বল্‌তো—Excuse me, Sir, we can just follow you, we can understand you, but we won't be able to explain. আমি Chemistry পড়ি, তাই বলে

কি আমার German, French-এর বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার ? shall, will-এর difference-এ দরকার নেই। acquiesce to বা of এ-সব দরকার নেই। যখন ইংরেজ এ দেশে আসে, আমরা intoxicated হয়ে গিয়েছিলাম। ইংরেজীর স্রোত একদিন দরকার ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—যিনিই হোন না কেন, ইংরেজী হতেই তাঁরা তাঁদের পথের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু বাংলা ভাষা যদি আজ শিক্ষার বাহন হত ত' ফরাসী জার্মানের মত আমাদের মাতৃভাষাও অদ্ভুত সৃষ্টি সব করে ফেলত। জগতের ইতিহাস, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ইত্যাদিতে আমাদের সাহিত্য যে কত সমৃদ্ধশালী হতো তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে মাতৃভাষা একঘরে' হয়ে রয়েছে—আর জাপানে এই মাতৃভাষা শিক্ষা বিস্তারে কি ভয়ানক কাজ করেছে। ১৮৬৯ সালে জাপান সম্রাট ঘোষণা করলেন যে—দশ বৎসরের মধ্যে There shall not be a village without elementary education nor shall there be a family without it. ফলে আজ দেখি সেখানে দুখানি খবরের কাগজের circulation ২৫ লক্ষ—আর এখানে খুব বেশী ত, ২০ হাজার। সেখানে রিকশাওয়ালারা বসে আছে—খবরের কাগজ পড়ছে। তারাও দুনিয়ার খবর রাখে, দেশের বিষয় আলোচনা করে। চাষী লাঙ্গল চষছে—সেও খবরের কাগজ পড়ে ; ঝি চাকরাণী সবাই। ১৮৬৯ সালের মধ্যে সেখানে 99 p. c. literate আর আমাদের দেশ আজ দেড়শো বছরের উপর ইংরাজী শিক্ষার মোহে মাত্র 7 or 8 p. c. literates —অর্থাৎ এঁকা বেঁকা, কোনও রকমে নামটি সহি করতে পারে। প্রকৃত literate 1 p. c. কিনা সন্দেহ। এটা ভাববার বিষয়। তাছাড়া মাতৃভাষায় যদি Elementary Education হতো, তাহলে যতদূর সম্ভব গ্রামের লোক গ্রামেই থাকতো। এখন উচ্চশিক্ষার প্রলোভনে ছেলেরা সব সহরে আসে পরে আর গ্রামে বাস করতে চায় না—ফলে বাংলার বুকে সব অবাঙালী এসে শিকড় গেড়ে বসেছে—বাংলার অলিতে গলিতে বসে তারা অর্থ শুষে নিয়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাবীরা বলে থাকে, যদি রোজগার করতে চাও ত বাংলা মুল্লুকমে যাও। ছেলেবেলায় দেখেছি, মগ, বোম্বেওয়ালা আমাদের খুলনা জেলায় সব দাদন দিয়ে যায় আর চিংড়ি এবং অন্যান্য সব মাছ অজস্র সিদ্ধ করে চালান দেয়। তার মুনাফা পাচ্চে বম্বের লোক—আর আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী সব সহরে বাস করছি। সেদিন "বসুমতী"তে দেখছিলাম—চাকুরে বাঙালীর গড়-পড়তা মাইনে ৪০/৫০ টাকা—তা থেকে ঘরভাড়া ১০ টাকা দিতে হয়—এমন ঘর যেখানে মানুষ থাকতেই পারে না। বিধাতা দুইটি জিনিষে শুল্ক বসাতে পারেন নি, কিন্তু এই সব লোক air ও light বিহীন ঘরে সেঁত সেঁতে মেঝেয় কি রকম করে body ও soul একসঙ্গে রাখে, আমি ত' তা ভেবে পাই না। ১০ টাকায় যক্ষার বীজ পূর্ণ আলো বাতাসহীন ঘর ছাড়া আর কি মিলবে ? এই সব দেখে মনে হয়—we exist but we do

not live. সহরে phithisis mortality দেখে কান্না পায়। ১০ বছর বয়স থেকে ৪—1—a ব্লে করতে করতে যখন বাঙালী বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ দ্বারের বাইরে এসে দাঁড়ায়—দেখে সে কোন কাজেরই উপযুক্ত নয়। এই জন্যই বলতে চাই যে গ্রামে যার ৪ ছেলে আছে, তার মধ্যে তিনজনকে গ্রামেই রেখে বাকি সর্বশ্রেষ্ঠটিকে উচ্চ শিক্ষা দিন। বাংলার পাট, চাল সরষে, তিশি, মাছ যা থেকে ৬০০ কোটি টাকা আয় হয়, তার ৬০ লক্ষ টাকাও বাঙালীর ঘরে আসে না। অবাঙালীর হাতে এই অর্থ দিয়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ? তা নয়, সব যেন ঘোড়া—সোজা দৌড়—ঐ **Examine** পাশ করো, **Examine** পাশ করো, **Examine** পাশ করো। অর্থ সমস্যা আর অন্ন সমস্যার সঙ্গে শিক্ষা-প্রণালীর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শিক্ষার আমূল সংস্কার চাই—তবেই অন্ন সমস্যার সমাধান হতে পারে।

আমেরিকা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করছে—সেখানে একটি Secondary স্কুলে ৭০০/৮০০ ছেলে। Statistics নিয়ে দেখা গেছে তারা Summer-এ ছুটির সময় হোটেল প্রভৃতিতে কাজ করে, winter-এ পড়ে। কেউ কলেজ ও স্কুল দুই জায়গাতেই পড়ে। সেখানে তারা শিখবে বলে পড়ে—উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা—তাই শীঘ্র অনেক শিখতে পারে। এ শিক্ষা বেশী বয়সেও হতে পারে। আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায় মধ্য বয়সে ইংরাজী শিখেছিলেন, কিন্তু আজও তাঁর মত ইংরাজী লিখতে কাউকে দেখলাম না। যে রকম অসাধারণ পাণ্ডিত্য তিনি দেখিয়েছেন, তা কোনও বাঙালী পারেনি। Lord Amherst-এর নিকট তিনি যে ইংরাজীতে পত্র লিখেছিলেন, তাঁর বাঁধন দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমি বলি আজকের দিনে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র সেন ও স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—এঁরা কেউ কলেজে পড়েননি। আমি ত প্রায়ই বলে থাকি—It would have been an evil day for Bengal if Sir Rajen would have comeout successfully from the Shibpore Engineering College—আর এখনকার দিনের এ শিক্ষায়ই বা কি হয়? টুলো পণ্ডিতদের মত কেবল উদ্গীরণ—যাজ্ঞবল্ক্য এই বলেন, মনু এই বলেন—পরাশর এই বলেন—কিন্তু বাবা তুমি কি বলো?—The more learned they grow, more ignorant they become.

[নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা এলবার্ট হলে ২৭শে আগস্ট ১৯২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের সভায় প্রদত্ত ভাষণ]

১৪

জ্ঞানের সমন্বয়

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আমরা কোন দেশবিশেষের প্রভাবে জন্মেছি এবং সেই দেশের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে। কিন্তু যদি আমাদের প্রাণ বিশ্বজগতের অন্য কোথাকার আকাশ বা বাতাসে স্পন্দন উৎপাদন না করে, যদি আমরা অন্য দেশের বায়ুতে আড়ষ্ট মৃতপ্রায় হয়ে থাকি, তবে আমরা হয়ত বাঙলী হ'ব, কিন্তু মানুষ হ'ব না। এরূপ লিলিপুটদের সাধের ধন "জাতীয় ভাব" বা স্বদেশীত্ব বেশীদিন বাঁচবে না।

শরীরের মত, মনেরও শ্রেষ্ঠ খাদ্য সংগ্রহ করতে হ'লে বিশ্বসংসারে খোলা বাতাসে খোলা আকাশতলে বাহির হ'তে হবে। কারণ আমাদের বাঙালীত্ব অপেক্ষা আমাদের মনুষ্যত্ব অনেক বেশী বিস্তৃত বেশী মূল্যবান। যদি আমরা বিশ্ব-মানবের সঙ্গে আমাদের বেশভূষা—রীতি নীতির বাহ্য পার্থক্য সত্ত্বেও, তার চেয়ে অধিকতর গভীর অন্তরের একতা অনুভব করতে না পারি, যদি মানবের সনাতন ভাবে এবং ভাবনায় চলতে না পারি, তবে বুঝতে হবে যে আমাদের মানব হতে এখনও অনেক দেরী আছে, আমরা প্রাণী জগতের অন্য এক শ্রেণীর জীব; অভি-ব্যক্তির সোপানে এখনও পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারিনি। এটা গর্ব করবার নয়, এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকলে, এই নিয়ে বড়াই করলে আমাদেরই ক্ষতি হবে; বিশ্ব-জগতের মানবজাতির ক্ষতি হবে না।

যা সত্য, যা সুন্দর, যা শিব, তা দেশে বা কালের সীমায় আবদ্ধ নয়। কোন দেশ বা কাল তার দেহটা, তার ভাষাটা, তার বাহ্য আবরণটা মাত্র দেয়, কিন্তু তার প্রাণটি দেশ কালের অতীত। যা মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার চিহ্ন হচ্ছে যে, তা সর্বদেশে সর্বযুগে মানবের প্রাণে প্রবেশ করবে, সকলেই তাকে আদর করবে।

কেবল বিজ্ঞান নয়, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি কলার চর্চা যতদিন না দেশে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে ততদিন বাংলা-সাহিত্য সর্ব অবয়ব সম্পন্ন, হতে পারবে না। লোহা ও পাথরের সংঘর্ষে অগ্নির উৎপাদন হয়। এক জ্বলন্ত দীপ হ'তে অপর দীপ জ্বালান যায়, যদি দ্বিতীয়টায় প্রকৃত তেল ও শলতে থাকে। বিদেশী সাহিত্যের ও কলার উজ্জ্বল জীবন্ত রশ্মি হ'তে আমরা দূরে থাকি, তবে আমাদের অন্তরের দীপ সাজান থাকবে, কিন্তু জ্বলবে না। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে—একঘরেদের সমাজে নহে।

১৫

ছুটীর অবকাশে ছাত্রদের কর্তব্য

কতকগুলি বিষয় নিয়ে আমি কিছুদিন থেকে কাগজে পত্রে লিখছি এবং সর্বত্রই ব'লে বেড়াচ্ছি। আজ তোমাদের গ্রীষ্মের ছুটী হবে. দীর্ঘ একমাস তোমাদের অবকাশ থাকবে। তাই সেই সব বিষয়ের দু একটা তোমাদের কাছে বলব। বাংলাদেশের সর্বত্রই আমি বলে থাকিনে। কেবল স্কুলের পাঠ্য পুস্তক প'ড়ে, সেই পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে আর কিছু হবে না। আর তা থেকে প্রকৃত লেখা-পড়াও শেখা যায় না। জ্ঞানলাভ করতে হ'লে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়া বাইরের বইও অনেক পড়া চাই। তা না হ'লে তোমাদের শিক্ষা কিছুতেই ফলবতী হবে না। এই যে, আই-এ, বি-এ পাশ করা ছেলেদের দেখতে পাও, যারা পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ ক'রে পাশ করে, তাদের প্রকৃত শিক্ষা প্রায় কিছুই হয় না। প্রকৃত জ্ঞান কিসে হতে পারে, সে চিন্তাও তাদের মনে আসে না। আজ একশ বছর এই ভাবে চলছে। বাঙালী ছেলের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—পাশ ক'রে চাকরী করব—যেন এছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

কিন্তু পৃথিবীতে যত বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের অনেকেরই এমন কি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যাবারও সুবিধা বা অবসর ঘটেনি। তাঁদের দু'এক জনের নাম তোমাদের কাছে করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনলে বুঝতে পারবে যে নিজের চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা মানুষ জীবনে কিরূপ সাফল্য লাভ করতে পারে। পৃথিবীর বিখ্যাত মনীষীগণের অনেকেই নিতান্ত দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন।

তোমরা গ্রামোফোন দেখেছ এবং তার গানও শুনেছ। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত' গ্রামোফোনের আবিষ্কর্ত্তার নাম জান না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসন্ এই গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন।

এডিসন্ এক দরিদ্র বিধবার পুত্র। বাল্যকালে তাঁর সাংসারিক অবস্থা এমন ছিল যে বিদ্যালাভ করার কোন সুযোগই তিনি পান নি। ছেলেবেলায় তাঁর মা তাঁকে পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তার বুদ্ধিশুদ্ধি দেখে তাঁর গুরুমশাই আবিষ্কার করলেন যে তাঁর মাথার মধ্যে গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। এবং লেখা পড়া শেখা তেমন হাঁদা ছেলের কর্ম নয়। তাঁকে পাঠশালা ছাড়তে হ'ল এরপর এডিসন রেলওয়ে স্টেশনের ধারে ফেরিওয়ালার কাজ করতেন? তারপর তোমরা দেখ যে নিজের চেষ্টা এবং যত্নের দ্বারা কিরূপে তিনি এইরূপ আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন; বিজ্ঞান জগতে 'যাদুকর' ব'লে খ্যাতিলাভ করেছেন। এত' গেল বড় বৈজ্ঞানিকের কথা।

তারপর দেখা যাক বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি কে। পূর্বে ছিলেন 'রক্‌ফেলার'। তবে এখন যিনি শ্রেষ্ঠ ধনী তাঁর নাম হেনরি ফোর্ড। ফোর্ডও ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। বাল্যে হেনরিকে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠান হ'ল তাঁর শিক্ষকগণও তাঁকে গর্দ্দভ ব'লে সাব্যস্ত করলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, স্কুলের শিক্ষা ফোর্ডের কিছুই হয় নাই। চোদ্দ বছর বয়সের সময় হেনরিকে তাঁর পিতা জমিজমার কাজ দেখতে বলেন ; কিন্তু হেনিরর সে কাজ পছন্দ হ'লো না। তিনি তাঁর পিতার নিকট তাঁর অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে ব'ললেন, "বাবা, আমাকে কোন বৈদ্যুতিক কারখানায় শিক্ষানবিশী করবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।" পিতা পুত্রের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁকে এক কারখানায় ঢুকিয়ে দিলেন। সেই হেনরি ফোর্ডের বিশাল কারখানা আজ জগৎবিখ্যাত। পৃথিবীর অনেক দেশেই তাঁর মোটরের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। প্রতিদিন চারহাজার মোটর এই সব কারখানা থেকে তৈরী হ'য়ে বেরুচ্ছে। তাঁর ধন আজ অপরিমেয়। গড়ে তাঁর বার্ষিক আয় ৩০।৪০ কোটি টাকা—অর্থাৎ দৈনিক দশলক্ষেরও অধিক। আমাদের এই সমগ্র জেলাটার ভিতর, তাই বা কেন, সমগ্র বাংলা দেশে বোধ হয়—আর বোধ হয় কেন, এমন একজন জমিদারও নেই যার বার্ষিক আয় দশ লক্ষ টাকা। তা হ'লে তোমরা দেখ, যে বালককে পাঠশালার পণ্ডিত মশাইরা গর্দ্দভ বলে নির্দ্দেশ ক'রেছেন, তিনি আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী।

এ প্রসঙ্গে তোমাদের কাছে আমি আর একটি লোকের নাম করব। তাঁর নাম হচ্ছে চার্লস সীব্রুক। ইনিও স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প'ড়ে লেখাপড়া শেখেন নি। পাঁচ বছর বয়স থেকে চার্লি ক্ষেতে কাজ আরম্ভ করেন। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি একজন জোয়ানের কাজ করতে পারতেন। বাল্যকাল থেকেই তরীতরকারীর ক্ষেতে কাজ করতে ভালবাসতেন। এখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। তাঁর ক্ষেত থেকে উৎপন্ন তরীতরকারী বছরে বিক্রী হয় প্রায় পনের লাখ টাকার। আমরা কি চেষ্টা করলে পনের হাজার টাকার জিনিষও উৎপাদন করতে পারি না ? তোমরা হয়ত' বলবে যে, তিনি কলেজে পড়ে কৃষি বিদ্যা লাভ করে এরূপ করেছেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি কোন স্কুল-কলেজে প'ড়ে শিক্ষালাভ করেন নি। নিজে নিজের ক্ষেতে কাজ করতেন আর অবসর সময়ে কৃষি বিদ্যা বিষয়ক নানাবিধ বই প'ড়তেন। কিছুদিন চাষ আবাদের পর চার্লি দেখলেন যে, জমিতে নিয়মিত ফসল উৎপাদন করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত সার দেওয়া দরকার। নিয়মিত সার না পড়লে ক্রমে ক্রমে জমির উৎপাদন শক্তি নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই তিনি এক এক একর অর্থাৎ তিন তিন বিঘা জমিতে প্রায় দশ' টন সার দেন। চার্লস কৃষি-কাজ করে এরূপ উন্নতি লাভ করেছেন, ক্ষেতে জল সেচনের জন্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন করেছেন ; আমাদের দেশে এক বছর বৃষ্টি না হ'লে আমরা মারা যাই। হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার এই দোষ। বিহারে,

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরও অনেক স্থানে ক্ষেতে জল সেচনের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করতে হয়। আমরা যদি পরিশ্রম না করি, কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে নিরুদ্বেগে বসে থাকি, তরে আমরা অন্নহীন হবো না তো হবে কে? আবার কেবল লোকজনের উপর নির্ভর ক'রে বসে থাকলে কৃষি কাজ হয় না। লোকজনের সঙ্গে নিজেকেও খাটতে হবে। সেইজন্য কথায় আছে—খাটে খাটায় পুরো পায়। না হ'লে সুযোগ পেলেই তারা কাজে ফাঁকি দেবে—কথায় বলে 'বামুন গেল ঘর ত' লাঙল তুলে ধর।'

তোমরা হয়ত বলবে আমাদের দেশে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। এই ক্ষুদ্র জমিতেই প্রচুর দ্রব্য প্রস্তুত হ'তে পারে, এ আমি নিজে দেখেছি। পলতায় আমাদের এনামেলের কারখানা আছে। সেখানে একটা লাউগাছ হ'য়েছিল। তাতে প্রায় ২০০ লাউ হ'য়েছিল। এরূপ ঘটনা বিরল নয়। এ ছাড়া বারাকপুরে দেখেছি যে ছোট ছোট জমিতে তরিতরকারি ক'রে সেখানকার কোন কোন পশ্চিমা শ্রমজীবী বেশ গৃহস্থ হ'য়ে উঠেছে। তারা এই সব জমিতে – ঝিঙে, উচ্ছে, কাঁকুড়, পটল, বেগুন প্রভৃতি নানা প্রকার তরিতরকারি প্রস্তুত করে এবং কলকাতায় অথবা ঐ খানেই পাইকারের নিকট বিক্রয় করে। বছর বছর তারা জমিতে সার দেয়। জাপানে এই সার অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। জাপানে কৃষকেরা গৃহস্থের বাড়ী থেকে মলমূত্র অতি যত্নের সঙ্গে নিয়ে যায়। এ ছাড়া গোবর, ঘোড়ার মল তো আছেই। চীনেও এরূপ চলছে। আর যদি তোমরা কৃষি-বিদ্যার কথা তোলো তাহ'লে আমি ব'লব যে, যাঁরা যাঁরা এ পর্যন্ত সরকারী ব্যয়ে বিদেশে গিয়ে এ বিদ্যা অর্জন করেছেন, কার্যক্ষেত্রে তাঁরা কিছুই করতে পারেন নি।

এ বিষয়ে এই পর্যন্ত। তোমাদের ভেতর যারা খবরের কাগজ পড়, তারা বর্তমান চীন সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত আছ। এই চীন একটা মস্ত দেশ। এ দেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি। এ যাবৎ চীন আমাদেরই মত পরপদানত ছিল। কিন্তু এখন সে তার তিন হাজার বছরের জড়তা দূর ক'রে পৃথিবীর বুকে সদর্পে মাথা উঁচু ক'রে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে তরুণ চীন দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। এখন দেখা যাক, কি করে চীন এতখানি উন্নতি লাভ করলে। চীনে বিভিন্ন ধর্মের বহুলোক বাস করে। চীনের অধিবাসী মুসলমানের সংখ্যাই প্রায় এক কোটী। কিন্তু এই সকল বিবিধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 'ছুৎমার্গ' বলে কোন কুসংস্কার নেই। কিন্তু এ জিনিষটা আমাদের উন্নতির পথে একটা মস্ত বিঘ্ন। আর আমাদের দেশে ব্রাহ্মণেরাই বেশী গোঁড়া। তাঁরা যখন মুসলমানের হাতে প্রস্তুত গোলাপ জল, লেমনেড, সোডা পান করেন, তখন তাঁদের জাতি বিচার থাকে না। কিন্তু যদি কোন নমঃশূদ্র ঘরের চৌকাঠ মাড়ায়, তা' হ'লে বিশ হাত দূরের খাদ্য তাঁদের নিকট অস্পৃশ্য হ'য়ে যায়। জানি না হিন্দুশাস্ত্রের কোথায় এরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ

আছে। হাঁ, চীনের কথা বলছিলাম। এ যাবৎ গৃহবিবাদই চীনের সমস্ত অবনতির মূল কারণ ছিল। কিন্তু চীন এক্ষণে নব বলে বলীয়ান হ'য়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। চীনের এই একতা এবং উন্নতির প্রধান কারণ চীনের যুবক ও ছাত্র সংঘের অক্লান্ত চেষ্টা। দেশের সাধারণ লোকের অজ্ঞতা দূর করার জন্য চীনের 'যুবক সঙ্ঘ' উঠে প'ড়ে লেগেছে। এই যেমন তোমাদের গ্রীষ্মের ছুটীতে স্কুল বন্ধ হ'চ্ছে, সেই রকম চীনে যখন সময় সময় স্কুল কলেজ বন্ধ হয়, তখন কলেজের ও স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা দলে দলে নিজের নিজের গ্রামে ফিরে গিয়ে পাঠশালা খুলে বসে। এই সব পাঠশালে হাজার হাজার চীনা বালক বালিকা লেখাপড়া শেখে। এ ছাড়া তারা নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং বয়স্ক লোকেরাও কলেজের ছেলের নিকট লিখতে পড়তে শেখে। চীন-জাপান যুদ্ধে চীন যখন তার দুর্বল অবস্থা বুঝতে পারলে, তখন প্রথমে প্রায় ১০।১৫ হাজার ছাত্র চীন থেকে বেরিয়ে বিদেশে শিক্ষালাভ করে ফিরে এলো। তার পর থেকে এই ভাবে চীনে জ্ঞানের বিস্তার হ'চ্ছে। যে সব ছাত্র দেশের ভিতর গিয়ে লেখাপড়া শেখায়, তারা সহর থেকে যাবার সময় সঙ্গে কিছু কিছু মনোহারী দ্রব্যাদি নিয়ে যায়। সেই সব সামগ্রী বিক্রী ক'রে তারা তাদের জীবিকার সংস্থান করে। এই ভাবে তোমরাও দেশের যথেষ্ট কাজ করতে পার। যারা উচ্চশ্রেণীর ছাত্র তারা নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সহজে লেখাপড়া শেখাতে পার। মাঝে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। ঢাকা শহরে ১২টি হাইস্কুল আছে। তা ছাড়া কলেজের ছাত্র ২০০০-এর বেশী হবে। এই সব স্কুলের প্রত্যেকটিতে গড়ে প্রায় চারশত ছাত্র আছে। সব সমেত প্রায় সাড়ে চার হাজার ছেলে পড়ে। তার ভেতর নীচের চার ক্লাশ বাদ দিয়ে ধরি বাইশ শ'। এই বাইশ শ' ছেলে গ্রীষ্মের বন্ধে একটু দিনে কম ঘুমিয়ে এবং পূজার ছুটীতে কম আমোদ ক'রে, দলে দলে ভাগ হ'য়ে গিয়ে দেশের ভেতর যদি এমনি ভাবে ছোট ছোট বালক বালিকাদের লেখাপড়া শেখায়, তাহ'লে কি ব্যাপার হয় ভাব দেখি। আর এমনি করলে সাম্প্রদায়িক বিবাদও অনেক কমে আসে, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তোমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে,– তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে কিছু না কিছু জমি আছে। তোমরা যদি সেখানে দু'টো তরকারীর বীজও পোঁত, কোদাল হাতে কাজ কর, তা হ'লে তোমাদের—সংসারের কত আসান হয়। কেউ কেউ অবশ্য আজকাল কিছু কিছু করছে, কিন্তু আশাপ্রদ কাজকর্ম কারুরই দেখা যায় না। তোমরা সব এই দীর্ঘ ছুটীতে যতদূর সম্ভব এই সব কাজ করবে আমি পূর্বে বলেছি এবং আবার বলছি যে কেবল স্কলারশিপ আর মেডেল পেলেই চলবে না। তোমাদের উদ্দেশ্য হবে মানুষ হওয়া—স্কলারশিপ এবং মেডেল পাওয়া নয়।

* ১৩৩৬ সালে আর. কে. বি. কে. এই সি. ইন্‌স্টিটিউশনের ছাত্রদের দেওয়া মৌখিক উপদেশের অংশ বিশেষ।

১৬

সত্যের সন্ধান

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আমার জীবনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে ; একটি চোখ হারাইয়াছি, এই শেষ যাত্রামুখে অস্তগামী সূর্যের ম্লান রশ্মিতে আমার এই দুর্ভাগা দেশের ঘরে ঘরে যে বিষাদের ছবি দেখিতেছি, এবং চারিদিকে দেশব্যাপী যে মর্মভেদী হাহাকার শুনিতেছি, তাহাতে আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। যে ব্যথা এবং দুঃখের আগ্নেয়গিরি আমার প্রাণের মধ্যে হুহু করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার জ্বালায় পাগল হইয়া আমি—যে দেশে "পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ"-এর ব্যবস্থা ছিল, সেই দেশে জন্মিয়াও আজ কাশী-কাঞ্চী, কাল মাদ্রাজ, পরশু বাঙ্গালোর, তারপর করাচী, লাহোর, ঢাকা-আত্রাই প্রভৃতি স্থানে এই বয়সে উল্কাপিণ্ডের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এবং দেশের যুবকদিগকে শান্ত সমাহিত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বেড়াইতেছি।

আমি সারা জীবন রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং গবেষণা লইয়াই কাটাইয়াছি ; এ ব্রতের মূলসূত্রই হইল সত্যের অনুসন্ধান—খাঁটী, নিছখ ষোল আনা সত্যের অনুসন্ধান এবং তাহার প্রয়োগ ;—এখানে পাই পয়সারও ভেজাল চলে না, এবং মিথ্যার সহিত এতটুকুও সন্ধি করা যায় না। চিরদিন সত্যের অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় সত্য স্বরূপের উপাসনাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং এই দীর্ঘকাল সেই সত্যস্বরূপের ধ্যান, ধারণা এবং উপাসনাকেই জীবনের ধ্রুবতারারূপে লক্ষ্য রাখিয়া পথ চলিয়াছি।

লোকে অনুযোগ করিয়া আমাকে বলেন যে সারাজীবন test tube নাড়াচাড়া করিয়াই ত জীবন কাটাইলেন—কিন্তু এই বয়সে আবার খদ্দর, সঙ্কটত্রাণ, দেশী কলকারখানা স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন, এবং বাঙালী ছেলেদের মাথায় ডাঙ্গশ মারিয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিবার বাতিক চাগাইল কেন ?

এই কেনরই উত্তর আজ দিতেছি।

প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল অধ্যাপনার কাজ করিয়া আসিতেছি, এবং সেই উপলক্ষ্যে কত হাজার ছাত্রকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ রাহু নামক কোনও রাক্ষসের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টায় সূর্য এবং চন্দ্রকে গলাধঃকরণের ফলে সংঘটিত হয় না, এবং শেষে মর্ত্যবাসীদের কাঁসর, ঘণ্টা, ঝাঁজর এবং খোল করতালের সহযোগে পূজা অর্চনার ফলে রাক্ষসাধিপতি রাহু তৃপ্ত এবং তুষ্ট হইয়া

কবলিত চন্দ্রসূর্যকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই তাহাদের মুক্তি সংঘটিত হয় না। এই যে সকল জনশ্রুতি, ইহা নিছক মিথ্যা এবং কল্পনাপ্রসূত।

পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্য আপন আপন কক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িলে এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়িলেই চন্দ্র ও সূর্যের অংশ বিশেষ ঢাকা পড়ে এবং যে পরিমাণ ছায়ায় ঢাকা পড়ে, তাহাই আংশিক বা পূর্ণগ্রহণরূপে পৃথিবীতে দেখা যায়। ইহাই চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা,—ইহাদের মধ্যে রাহুর আক্রমণ এবং তাহার মুখগহ্বর হইতে চন্দ্রসূর্যের নিষ্কৃতি ও মুক্তির যে মিথ্যা এবং কাল্পনিক কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহা আগাগোড়াই ঝুঠা।

আজ অর্ধ শতাব্দীকাল ছাত্রদিগকে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া আসিলাম, তাহারাও বেশ বুঝিল এবং মানিয়া লইল ; কিন্তু গ্রহণের দিন যেই ঘরে ঘরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং খোল-করতাল সহযোগে দলে দলে কীর্তনীয়ারা রাস্তায় মিছিল বাহির করে, অমনি এই সকল সত্যের পূজারীরাও সকল শিক্ষাদীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়া দলে ভিড়িতে আরম্ভ করে এবং ঘরে ঘরে অশৌচান্তের মত হাঁড়িকুঁড়ি ফেলার ধুম লাগিয়া যায়।

সেই হইতে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাবের ঘরে এত লুকোচুরি চলে, তাহাদের মুক্তি সুদূর-পরাহত। আমি অশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর লোকেদের কথা বলিতেছি না ; কারণ জনশ্রুতি, দেশাচার এবং লোকাচারই তাহাদের নিকট ধর্ম—যুক্তির দ্বারা সত্য-মিথ্যা বাছিয়া অথবা বিচার করিয়া লইবার মত শিক্ষা বা সামর্থ্য তাহাদের নাই। যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায় সত্য কি তাহা জানে এবং বোঝে, কিন্তু জীবনে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে,—মনের গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সত্যের নিকট লজ্জায় মস্তক অবনত করিতেছে,—অথচ, বাহিরে জনসমাজে এবং সভার মাঝারে তাহাকে স্বীকার করিবার সাহস নাই—সে জাতি কেমন করিয়া জগতের নিকট সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তাহা আমার বুদ্ধির অতীত। আজ প্রায় একশতাব্দী হইতে চলিল আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে যে গৃহযুদ্ধ (**Civil war**) হয়, তাহার কথা সকলেই হয় পড়িয়াছেন, না হয় শুনিয়াছেন। যুদ্ধটির প্রধান কারণও বোধ হয় অনেকে জানেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপীয়গণ আরব দাস-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে আফ্রিকাবাসী কাফ্রীদিগকে গোরু ছাগলের মত কিনিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া নিজেদের দেশে আনিত এবং তাহাদিগের দ্বারা ক্ষেত্রে ও খনিতে কাজ করাইয়া লইত। গোরু বাছুর যেমন কেনাবেচা হয়, আফ্রিকা ও আমেরিকার বাজারে তেমনি এই সকল কাফ্রী নরনারীদের কেনা বেচা চলিত।

এই সকল ক্রীতদাসদাসীর জীবন কাহিনী মিসেস স্টো (**Mrs. Stowe**) তাঁহার **Uncle Tom's Cabin** নামক গ্রন্থে হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন ;

এই যুগান্তকারী গ্রন্থ পাঠ করিয়া মানবতার মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী ইংলণ্ড ও আমেরিকার নরনারীদের প্রাণে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। তাহারা বুঝিল **Fatherhood of God and Brotherhood of Man,** ক্রাইষ্টের এই যে অমর বাণী, ইহা তাহারা তাহাদিগের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানবজীবনে এবং জগতে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। আমেরিকাবাসীদের অনেকের মনে কে যেন ধাক্কা দিয়া বলিতে লাগিল, দাসত্ব প্রথা অন্যায় এবং অধর্ম—ইহাকে তুলিয়া দাও।

যাহাদের প্রাণ ছিল, তাহারা এই বাণী শুনিয়া দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিতে কৃত-সংকল্প হইল, কিন্তু অপরদিকে, এই ব্যবসা হইতে যাহাদের প্রচুর লাভ হইত, এবং বিনাব্যয়ে যাহাদের বিরাট কৃষিক্ষেত্র সমূহের চাষবাস হইত, তাহারা নিজেদের স্বার্থহানির ভয়ে ঘোরতর আপত্তি তুলিল। দেশে দুই দল হইল ; একদল দাসত্ব-প্রথা উঠাইয়া দিবেই, অপর দল এই প্রথা বজায় রাখিবেই। শেষে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল, এবং চার বৎসর ধরিয়া **Civil war** চলিল। পৃথিবীতে এমন গৃহযুদ্ধ পূর্বে কখনও হয় নাই। চল্লিশ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে যোগদান করে, এবং আমেরিকায় প্রায় এমন গৃহ ছিল না, যাহার একজন বা দুইজন লোক এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই। বহু লক্ষ লোক যুদ্ধে হতাহত হয়। শেষে ধর্মেরই জয় হইল। আমেরিকা হইতে দাসত্বপ্রথা উঠিয়া গেল।

জাতিভেদ শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদরূপ মহাপাপ যতদিন হিন্দু সমাজকে জর্জরিত করিবে, এবং মানুষে মানুষের মধ্যে নানারূপ বিধিনিষেধ ও গণ্ডী টানিয়া কেবল দ্বন্দ্ব, কোলাহল ও ভেদবুদ্ধির বিষ ছাড়াইতে থাকিবে, ততদিন এ জাতির মুক্তির আশা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বিড়ম্বনা মাত্র।

১৮৬৮ সালে জাপান যখন নবজাগরণের সাড়া পাইয়া মোহনিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিল, তখন সর্বপ্রথমেই তাহারা বুঝিল, জাপানের নিম্ন শ্রেণীস্থ অগণিত নরনারীকে সামুরাই বা ক্ষাত্রিয়গণ যে ভাবে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দলিত এবং অবনত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে জাপানের মাথা তুলিবার আর কোনও আশা নাই। যেমন এই সত্য উপলব্ধি করা, অমনি সামুরাইগণ নিজেদের সকল আভিজাত্য গৌরব চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জাপানকে ক্ষাত্র-ধর্মে দীক্ষিত ও উন্নীত করিয়া লইল। জীবন্ত জাতির লক্ষণই এই।

যাহা সত্য, মঙ্গল এবং করণীয় তাহা সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙ্‌লার যুবকদিগকে আজ সকল রকম ন্যাকামি ও কপটতা পরিত্যাগ করিয়া এই সত্যের সম্মুখীন হইতে বলিতেছি।

আজ একবার আত্মপরীক্ষা কর। মনকে জিজ্ঞাসা কব—জাতিগঠনের উপাদান কি আমাদের মধ্যে আছে? যদি না থাকে, তবে সে উপাদান তৈরী করিবার কোনও আয়োজন কি আমরা করিয়াছি?

আজ ভারতের কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে কন্যাকুমারী এবং বোম্বাই হইতে ব্রহ্ম

সীমান্ত পর্যন্ত দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সর্বত্র, জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ধর্মে ধর্মে, শুধু দ্বন্দ্ব-কোলাহল নহে, রক্তারক্তি, মারামারি, কাটাকাটি আরম্ভ হইয়াছে। ভারতে মুসলমান অভিযান আরম্ভ হইবার বহুশতাব্দী পূর্বেও হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের কথা ভারতের প্রতি বৌদ্ধমন্দিরের প্রস্তর মূর্তিতে এবং ভগ্ন দেউলে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মধ্যে ধর্মের আদর্শ এবং ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া মারামারি কাটাকাটির কথা বাঙলার ঘরে ঘরে জনশ্রুতি হইয়া আছে। হাঁড়ী ডোমের জল খায় না, ডোম মুচির অন্ন ছোঁয় না, মুচি মাইঠ্যালের সঙ্গে উঠা বসা করে না,—আবার কায়স্থ ইহাদের কাহারও ছোঁওয়া অন্ন-পানীয় গ্রহণ করে না, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ আবার কায়স্থকেও অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। এমনি করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে মানুষে মানুষে জাতিবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য এবং বিদ্বেষবুদ্ধিজাত ভেদ ও বিবাদের যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া এক দেশ এবং এক জাতি গঠন করিবার সকল শক্তিই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

বেদের আমল হইতে স্মৃতি ও সংহিতার যুগ পর্যন্ত এদেশে মুখ্যতঃ কেবলমাত্র দুইটি জাতির উল্লেখ দেখা যায়—ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র। সংখ্যার দিক দিয়া দেখলে একশত জন হিন্দুর মধ্যে মাত্র ৬ জন ব্রাহ্মণ এবং বাকী ৯৪ জন শূদ্র। শতকরা ৯৪ জনকে অন্ধ, খঞ্জ এবং পঙ্গু করিয়া রাখিয়া, মাত্র ৬ জন শিক্ষিত লোকের দ্বারা দেশে স্বরাজ অথবা স্বাধীনতা আনয়নের প্রয়াস যে বাতুলের কল্পনা, তাহা গত কয়েকবারের নিষ্ফল আন্দোলনে ভগবান আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। যুগ-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার জনসাধারণের সহিত ভারতের অবনত শ্রেণীর দুর্দশার কথা তুলনা করিয়া বেদনাবিদ্ধ প্রাণে এক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন,

—"আমাদের দেশে যদি কারুর নীচকুলে জন্ম হয়, তবে তার আর কোনও আশা ভরসা নাই—সে জন্মের মত গেল। কেন হে বাপু? - একি অত্যাচার। আমেরিকায় সকলেরই আশা আছে, ভরসা আছে, সুযোগ এবং সুবিধা আছে। আজ যে গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎমান্য হবে। আজ যে রাস্তায় বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে, কাল সে প্রেসিডেণ্ট হইবারও আশা রাখে। আর আমাদের দেশে?—**Once a cobbler, ever and always a cobbler** —মুচির ছেলে ছাপান্ন পুরুষ ধরিয়া মুচিই থাকিবে, তাহার কোনও উচ্চ আশা নাই—থাকিতে পারে না। কারণ, এদেশে মুচির ছেলের আর শুচি হইবার উপায় নাই।"

হায় আমরা কি মানুষ?—ঐ যে হাঁড়ী, ডোম, বাগদী, চামার, মালী, মাইঠ্যাল তোমার বাড়ীর আশে পাশে চারিদিকে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে এবং পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে, উহাদের উন্নতির জন্য তোমরা এই

যুগযুগান্ত ধরিয়া কি করেছ বলতে পার? তোমরা তাহাদের ছোঁও না, কাছে আসতে দাও না—দূর দূর কর। জাপানী কুকুরটাকেও আদর করিয়া কোলে পিঠে নিয়া বেড়াও—আর সুশ্রী সবল হৃষ্টপুষ্ট নাদুস্ নুদুস্ মুচির ছেলেটি যদি ঘরের দাওয়ায় হামা দিয়া ওঠে—তবে 'জাত গেল', 'ধর্ম গেল' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠ।

ওই যে তোমাদের হাজার হাজার ব্রাহ্মণ, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য এ যাবৎ কি ক'রেছেন, বলতে পার? খালি বলেছেন, তোরা অন্ত্যজ, আমায় ছুঁসনে, ছুঁসনে।

চামার যদি পেটের জ্বালায় একমুঠো অন্নের জন্য বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা তাহাকে হৃদয়হীনের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করি নাই সত্য, আমাদের পাতের উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জন তাহাকে দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার পূর্বে তাহাকে হাজার বার সমঝাইয়া দিয়াছি যে, তুই মুচি, তুই অস্পৃশ্য, এখান হইতে সরিয়া যা,- দূরে বাগানের কাছে গাছতলায় যাইয়া অপেক্ষা কর; সকলের খাওয়া হ'লে পাত কুড়ানো সব পাবি। এমনি করিয়া আমরা ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে যুগযুগান্ত ধরিয়া দলিয়া পিষিয়া রাখিয়াছি।

আগে মানুষ চাই, তবে ত ঈপ্সিত ফল লাভের জন্য সংগ্রাম করিবার সৈন্য পাইবে। **You can't make bricks without clay,** মানুষ চাই—মানুষ চাই—**Not quantity and number, but quality.** শুধু সংখ্যা **(Number)** হইলেই যদি হইত তবে ত ভারতবর্ষকে আর পায় কে? পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বাস যে দেশে—যাহার আয়তন একটা মহাদেশের মত—যদি সংখ্যাই ভাগ্যনিয়ামক হইত, তবে এই বিরাট দেশ এবং বিশাল জাতি কি মুষ্টিমেয় লোকের পদানত হইয়া থাকিত! কবি তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি!
রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ করনি!"

আমি দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, সত্যসন্ধী এবং সত্যাশ্রয়ী না হইলে কি মানুষ কি জাতি, কিম্বা কি দেশ, কাহারও মাথা খাঁড়া করিয়া উঠিবার সাধ্য নাই। দুই এবং দুইয়ে যোগ দিলে চার হইবে; উহাকে পাঁচও করা যায় না, তিনও করা যায় না। করিতে গেলে অঙ্ক মেলে না; জীবনভোর যদি এই চেষ্টা কর, তবে চেষ্টা ব্যর্থ এবং জীবন বিফল হইয়া যাইবে। মিথ্যার উপর কোনও মহদনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় না। তোমরা সত্যকে স্বীকার কর এবং বরণ কর। লোকচক্ষুর অন্তরালে নহে, কিম্বা মনের গোপনপ্রকোষ্ঠের মধ্যে নহে—জগৎ সভায়, বিশ্বমানবের সম্মুখে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া অকুতোভয়ে, বুক ফুলাইয়া, সতেজে, দীপ্ত অনুরাগের সহিত সত্যের জয় গান কর।

বাঙ্‌লার আশা ভরসাস্থল যুবকগণ! তোমরা আজ কোথায়? জাতিভেদের অত্যাচারে এবং সামাজিক নির্যাতনের হাত হইতে অগণিত নরনারীকে উদ্ধার

করিবার জন্য আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক নিষ্পেষণের ফলে যাহারা প্রায় পশু পদবীতে অবনত হইয়াছে, অথচ যাহারা ভারতীয় হিন্দুসমাজের হস্ত, পদ এবং মেরুদণ্ড, তাহাদিগকে তুলিবার জন্য, মূর্খতা ও কুসংস্কারের মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তোমাদের যৌবনের তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠ বাহু কি অগ্রসর হইবে না? এই অগণিত নরনারী কি চিরকালই এইরূপ হীন এবং অবজ্ঞাত জীবন যাপন করিবে? বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক, নব নব আবিষ্কারের কথা, কত আশা, আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষার বারতা কি তাহাদের নিরানন্দময় অন্ধকার কুটিরে কখনও পৌঁছিবে না? তাহাদের হৃদয়দ্বার কি চিরকাল এমনি রুদ্ধ থাকিবে?

এস, কে আছ হৃদয়বান্! কে আছ প্রেমিক! কে আছ কর্মী! কে আছ বীর! উহাদিগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর। প্রেমামৃত ধারায় সহস্র সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষবহ্নি নির্বাপিত করিয়া দাও। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, পাঠশালার বাণীমণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, হাটে, বাটে, ঘাটে, বাজারে, বন্দরে পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে এই মৃতসঞ্জীবনী বার্তা লইয়া যাও; আর বল, তোমাদের মহানিশার অবসান হইয়াছে।

বল—তোমরাও মানুষ—মেহেদীপাতার বেড়া নহ যে, মালীর ইচ্ছামত তোমাদিগকে নিয়ত কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়াই রাখিবে; যেই নূতন ডাল গজাইয়া মাথাটা বাড়াইবার চেষ্টা করিবে, অমনি মালীর সুতীক্ষ্ণ কাঁচিখানা কচাং করিয়া সেই ডালটিই ছাঁটিয়া ছোট করিয়া দিবে। না—না—তোমরা মানুষ, বাবুর বাগানের মেহেদীপাতার বেড়া নহ, কাষ্ঠ লোষ্ট্র নহ। আজ ভাঙ্গ তবে ওই জাতিভেদের পাষাণ স্তূপ—যাহা জগদ্দল পাথরের ন্যায় এই বিশাল জাতির বুকে বসিয়া তাহার শ্বাসরোধ এবং কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিয়াছে—চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেল ওই পাষাণ প্রাচীর, যাহা মানুষ এবং মানুষেয় মধ্যে নানারূপ ভেদ ও বিদ্বেষবুদ্ধির ব্যবধান রচনা করিয়াছে—এবং ভাই ভাইকে চিনিতে দিতেছে না।

বাঙলার নিগৃহীত এবং নিপীড়িত কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত উঠুক—

"ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়!
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে,
নবীন আশার খড়্গ তোমারি হাতে,
জীর্ণ আবেশ, কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়, তোমারি হউক জয়।"

১৭

এখন ও তখন

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আজ আমরা মহাযুগসন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছি। ইউরোপীয় মহাসমরের পর শান্তি স্থাপিত হয়ে জগতে একটা নবযুগ আসছে—অনেকেই সেই আশায় উৎফুল্ল হয়েছেন। আমরাও যে আশামুগ্ধ হয়ে এই পরিবর্ত্তনের দিকে দেখছি না এমন নয়। কিন্তু শুধু চেয়ে দেখায় লাভ কোথায় যদি এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে আমরা নবযুগকে বরণ করে নিতে না পারি? তাই আজ বিবেচনা করে দেখতে হবে আমাদের জীবন যেপথে চালিত হয়েছে তা এখন এই সামঞ্জস্য স্থাপনের নূতন উদ্যমপ্রকাশের অনুকূল অথবা প্রতিকূল।

আপনারা স্বর্গগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "সেকাল ও একাল" নামক উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ পাঠ করে থাকবেন। সে প্রবন্ধে তিনি নানাদিক থেকে সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করে দেখিয়েছেন। সেকালে ইংরেজী শিক্ষা করবার কি অদ্ভুত চেষ্টা দেখুন;—কখন কবিতা, কখন বা গানের আকারে ইংরেজী শব্দের বাঙলা অর্থ বলিয়ে তখন ছাত্রদের মুখস্থ করান হত; যথা—

পম্‌কিন লাউকুমড়ো, কুকুম্বর শশা।
ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু, প্লৌমেন চাষা॥

বসু মহাশয়ের "সেকাল ও একাল" থেকে আর একটা বড় মজার কথা উদ্ধৃত কচ্ছি।—একবার রথের দিন এক সরকার অফিস কামাই করে। পরদিন সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, "কাল আস নি কেন?" সরকার তো ভেবে আকুল। রথের ব্যাপার বুঝিয়ে দেয় কি করে? তারপর বলে উঠল "চার্চ্চ, চার্চ্চ স্যর" (Church)। কিন্তু রথ চার্চ্চের মত হলেও ইটের তৈরী নয়। তাই সে পরক্ষণেই বললে "চার্চ্চ চার্চ্চ স্যর" "Wooden Church" অর্থাৎ কাঠের গির্জ্জা। ক্রমে আরও ব্যাখ্যা, নচেৎ মনের কথা মনেই থেকে যায়। তাই—"Three stories high", "God Almighty (জগন্নাথদেব) sit upon", "Long long rope", "Thousand men catch," "Pull pull, run away, run away" "হরি বোল, হরি হরি বোল"। দেখুন তবে, সেকালের ইংরেজীনবীশ রথের কোনখানটা বুঝিয়ে দিতে বাকী রাখলেন? কিন্তু এই 'সেকাল' ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের আগেকার কাল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের পর যে কাল এল, সেই হচ্ছে বসু মহাশয়ের 'একাল'। কিন্তু তাঁদের একাল আজ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমাদের কাছে পুরাকাল হয়ে গেছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল আমাদের দেশে এক মহা

পরিবর্তনের যুগ বললেই চলে। এ যুগে ভাবে চিন্তায় ধর্ম্মে কর্ম্মে নূতন আদর্শের পরিকল্পনায়, দেশে নানা দিকে নূতন স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এ যুগে সামাজিক রাজনৈতিক, আর্থিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। দেশ বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছে। আজ তাই "পঞ্চদশ বৎসরে রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি"-র কথা না বলে আমাদের জাতীয় উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে মাত্র দু'এক কথার আলোচনা করছি। ব্যবসায়ী এক বৎসর অন্তর হিসাব-নিকাশ করে নূতন খাতা করেন। জাতির জীবনের হিসাব-নিকাশ এত সহজ ব্যাপার না হলেও ৫০ বৎসর পরে আজ আমরা সকলেই একবার সেই উদ্দেশ্যে চেষ্টিত হয়ে আলোচনা আরম্ভ করে দিয়েছি।

পরিবর্ত্তন অনেক হয়েছে। বড় কথা ছেড়ে প্রথমে এই একটা সাধারণ কথা ধরা যাক। এই ধরুন মহানগরী কলকাতার অবস্থা। তখন কলকাতার রাস্তার দু'ধারে বড় বড় পগার ছিল, সাঁকোর উপর দিয়ে তা পার হতে হত। ধাক্কাধাক্কিতে গাড়ি কোচোয়ান কখন কখন সব একসঙ্গে পগারস্থ হত।—ঘোড়া টেনে তোলা যেত না। আর সে পয়ঃপ্রণালীতে যে জলধারা প্রবাহিত হত, তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে আজকালকার কলকাতাবাসীকে অস্থির হয়ে উঠতে হবে। পিতার কাছে শুনেছি—মেথর তখন গঙ্গায় ময়লা ঢালত। কথা শুনে হয়ত এখন অনেক "সুকেশিনী সীমন্তিনী" প্রাতঃস্নানের নামে চমকে উঠবেন। কলের জল তখন সেই প্রথম আরম্ভ হয়েছে। সহরে মহা আন্দোলন পড়ে গেল। নলের মুখে **Stop cork** চামড়া দেওয়া আছে, তাই গোঁড়া হিন্দুর দল কলের জল ব্যবহার করবেন না বলে মহা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলেন। যা হোক কালধর্ম্মে বাদ-বিচার এমন বদলে গেল, যে আজ তাঁরাই আবার কলের জল বন্ধ হলে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেন, রাগে ফুটে ওঠেন। সেকালে দুচারটা ইংরেজী বুলি জেনে আমলারা বড় বড় কাজ চালিয়ে দিতেন ; যে যতগুলি ইংরেজী বাক্য মনে রাখতে পারত তার বিদ্যার দৌড় তত বেশী ধরা হত। কিন্তু একালে এম-এ পাশ করা যুবককে চাকরির বাজারে কি বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয় তা সকলেই জানেন।

আমরা যে আজ সামাজিক ও আর্থিক অথবা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের ঘূর্ণীর মধ্যে পাক খাচ্ছি, তার সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের মত আর আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নই ; আজ এই বাষ্প ও তড়িৎ-শক্তির যুগে, এই রেল, টেলিগ্রাফ ও জাহাজ প্রচলনের দিনে, নানাজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে আমরা আঘাতের পর আঘাত পাচ্ছি। এই ঘাত-প্রতিঘাত এখন চলতেই থাকবে, এর বিরাম নেই। আমরা বেশ শান্তিতে ছিলাম। দেশের মাটিতে সোনা ফলত, আনন্দে ও প্রাচুর্য্যে দিনগুলো বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে চলে যেত। কিন্তু আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকেই কয়েকটা প্রচণ্ড শক্তিশালী জাতি বুদ্ধি, কৌশল, রাজনীতি, কূটনীতি প্রভৃতি অবলম্বন করে

আপনাদের চলন্ত ও ছুটন্ত জীবনের বিপুল চাঞ্চল্য ও অদ্ভুত সঙ্ঘশক্তির উদ্দাম গতিবেগ নিয়ে অতি নির্ম্মমভাবে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমরা এখন ত্রাহি ত্রাহি করে সামলাবার পথ খুঁজছি। এই সামলাবার চেষ্টায় আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত, জাতির সর্ব্বতোমুখী উন্নতি ও বিকাশ। সমাজদেহের এক অঙ্গের পরিচালনা হলে মাত্র সেই অঙ্গেরই সৌষ্ঠব হবে, অপরগুলি পঙ্গুত্বে নেমে গিয়ে অসাড় ও অচল হয়ে থাকবে। এই ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রামের দিনে যদি আমাদের চেষ্টা ও উৎসাহ তদনুরূপ ভয়ঙ্কর না হয়, যদি সমাজের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ প্রাণ অনন্যকর্ম্মা হয়ে এই মহাসমস্যার মীমাংসায় নিয়োজিত না হয়, তবে পরাজয়ই আমাদের পক্ষে সুনিশ্চিত এবং এ-পরাজয়ের অর্থ জাতির মৃত্যু। পরিবর্ত্তনশীল জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে বুদ্ধি কৌশল ও প্রাণশক্তির বলে যারা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে, জীবন-সংগ্রামে তারাই টিকে যায়; আর নূতন নূতন ঘটনাপুঞ্জের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যারা অক্ষম হয়, কালে তাদেরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভূস্তর খুঁড়ে এমন অনেক অতিকায় জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেছে যাদের বংশধর পৃথিবীতে আর নেই। জীবন-সংগ্রামে টিকতে না পেরে এদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে গিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার এমন কতকগুলি আদিম জাতি ছিল, যারা প্রবল ইউরোপীয় জাতির আঘাতে ও আওতায় দুর্ব্বল হ'য়ে ক্রমে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমান জীবন-সংগ্রামও আমাদের পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর কথা; এর ফলাফলের উপর আমাদের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে। সুতরাং আমাদের এখন এমন কর্ণধার চাই যাঁরা সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পাকা হাতে হাল ধরে আমাদের সামাল করে নিয়ে যেতে পারবেন। জাতি সকল দিকেই আগুয়ান হয়ে চলবে—এই তাঁদের মূলমন্ত্র হবে।

একটা লোকহাসানো কথা আছে ঃ—

লঙ্কায় রাবণ মলো।
অহল্যা শোকে ডুবিল॥

কিন্তু এই হাসির কথা আজ পরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ যে একটা মহা আবর্ত্তনের সৃষ্টি হয়েছে, সব জাতিই তার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। তাই ইউরোপে অন্নাভাব হওয়ায় ভারতবর্ষের ভাণ্ডারে টান পড়েছে। তাই ইউরোপে যুদ্ধ হল আর, ভারতবাসী মারা গেল—সত্য কথা হয়ে গেছে। ভাত-কাপড়ের টানাটানি এমন আর কোনোকালে হয়েছিল কি? **Nature abhors vacuum**—একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতি রাজ্যে কোথাও যদি একটু বায়ু কোনো উপায়ে নিষ্কাশিত করে দেওয়া যায়, তবে তখনি অপর স্থানের বায়ু এসে তার স্থান পূরণ করে। মানব সমাজ সম্বন্ধেও আজ সেই নিয়ম খাটছে। একের অভাব অন্যে পূরণ করছে। কিন্তু এই পূরণের কাজ যে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নি, যাকে নিজের

ঘরের ভাত বাধ্য হয়ে অথবা বুদ্ধির দোষে অপরের মুখে তুলে দিতে হচ্ছে, দুর্দ্দশা আজ তারই। সমস্ত পৃথিবীতে আজ ঘটনাচক্র এমন আশ্চর্য্য বেগে ঘূর্ণমান যে এর ভিতরে অবস্থান করে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে, বিগত একশত বৎসরে আমরা যে-সব কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে রীতিমত আয়াস স্বীকার করি নি, আজ তা এক বৎসরে সেরে নিতে হবে, নইলে রক্ষা নাই। ম্যাঞ্চেস্টার আগে ৪০।৫০ কোটি টাকার কাপড় উৎপন্ন করে এ দেশে বিক্রয়ের জন্য পাঠিয়ে দিত। আজ সেখানে মাত্র ১০।১২ কোটি টাকার কাপড় তৈরী হচ্ছে। অবশিষ্ট অংশের কতটুকুই বা বোম্বাই পূরণ করতে পারছে? ধাক্কা সামলাতে হলে আমাদের এখন একদিনের নোটিশে অনেক কাজ এগিয়ে নিতে হবে।

স্বদেশে বিদেশে এখন শোনা যায় যে—আমাদের একটা জাতীয় জাগরণ হয়েছে। এটা খুব বড় কথা—খুব লম্বা চওড়া কথা। কিন্তু জাগ্রত জাতি মাত্রেই যে সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাপন শক্তি নিয়োজিত করছে আমাদের সে কর্ম্মক্ষেত্র কোথায়? আমরা কি জাগরণের উপযুক্ত কাজ করতে প্রস্তুত আছি? আমরা কি নিজের পায়ে ভর দিয়ে সংসার-পথে নির্ভয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করেছি। অথবা জাগরণের পর শুধু কুম্ভকর্ণের দুর্দ্দশা আমাদের জন্যে গোপনে অপেক্ষা করছে! এ পৃথিবীতে একেবারে বেঁহুস হয়ে আমরা অনেকদিন কাটিয়ে দিয়েছি। বেঁহুসের এ ঘুমভাঙ্গা কি সত্য ঘটনা? এ জাগরণে সত্য আছে—আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কোথায় কতটুকু জেগেছে, এ জনসংঘ কোথায় কি পরিমাণে সাড়া দিয়েছে তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। শুধু—জেগেছি, জেগেছি, বলে চীৎকার ক'রে আত্মপ্রতারণা করলে চলবে না। সক্রেটিস বলেছেন,—কোন বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণ করতে হলে—**passion, prejudice, sloth**—এই তিনটি বর্জ্জন করে অনুসন্ধান আরম্ভ করতে হবে। মনের যে দিকে বিশেষ ঝোঁক, আমাদের চিন্তাপ্রণালী যদি বিচার বিবেচনা না করে সেই ঝোঁকের মুখে প্রবাহিত হয়, যদি আমরা আলস্য ও অন্ধ সংস্কার বর্জ্জন করে আমাদের আলোচনার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত না করি, তবে সকল বিষয়ের অন্তরের সত্যটুকু আমাদের কাছে চিরকাল গোপন থাকবে, আমরা কখনই তা উদ্ঘাটন করে দেখতে সমর্থ হব না। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ভালমন্দ যা কিছু সবই সাবধানে বিশ্লেষণ করে পরিবর্ত্তিত ঘটনা-পরম্পরার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করতে হবে এবং ভবিষ্যতের গতি-নির্দ্দেশ এই সকল বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।

হিন্দুর মত খেতে-শুতে, উঠতে-বসতে, জন্মাতে-মরতে এমন বাঁধাবাঁধির মধ্যে আর কোন জাত আছে কিনা জানি না। জন্ম হতে আরম্ভ করে জাতক্রিয়াদি সংস্কার ইত্যাদি ধরে মৃত্যু পর্য্যন্ত এবং মৃত্যুর পরেও কেবল শাস্ত্রের দোহাই। এ কাজ কর, ও কাজ কর, এটা মনু বলেছেন, ওটা যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, এগুলি পরাশর বা বৃহস্পতি আদেশ করেছেন; এখন বারবেলা, তখন কালবেলা; আজ বাহিরে গেলে

সর্ব্বনাশ—কারণ ওই রাক্ষসী তারা দুটো অশ্লেষা আর মঘা ; ওই হাঁচি টিকটিকি, গিরগিটি ! চলা ফেরা, ওঠা বসায় এ কি দারুণ বিড়ম্বনা ! কিন্তু এত আগলেও আমরা সামলে রাখতে পারছি কই ? যমালয়ের দ্বার একেবারে খুলে গেছে। আর যমদূতগুলো নানা রোগের মূর্ত্তি ধরে এসে আমাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবার দেখুন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে যে সব বিদেশীরা এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সিন্দুক ভরে টাকা নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে, তাদের ওঠা-বসা, যাওয়া-আসার বারবেলা ও তিথিনক্ষত্রের কোনো শাসন নেই, তারা প্রত্যেক ব্যবহারেই স্ব-স্বাধীন, তাই সর্ব্বত্র তারা স্বাধীন। নানাপ্রকার অদ্ভুত লোকাচারের চাপে আমরা পঙ্গু হয়ে আছি, অথচ বার বার তাদেরই মেনে চলছি। কিন্তু সেই সাগর পারের লোকেরা কেমন মুক্ত স্বচ্ছন্দগতি, অবাধ ও আত্মনির্ভর।

ভগবান বিচারবুদ্ধি দিয়ে আমাদের মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং এ-সব কথা একবার আমাদের নিজে ভেবে দেখা উচিত। দেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সমাজদেহের আধখানা ত অসাড় গতিহীন হয়ে পড়ে আছে। আবার পুরুষদের মধ্যে যারা শিক্ষিত, লোকসংখ্যার অনুপাতে তারা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক যদি জীবনযাত্রাকালে কোথাও জীবনের পরিচয় না দিয়ে, সর্ব্ববিষয়ে পুরাতনের চাবুক খেয়ে পথ চলেন, তবে সে পথ তাঁদের মরণ পর্য্যন্তই পৌঁছে দেবে। কিন্তু মরতে ত আমরা চাই না। তাই সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি—সকল বিষয়েই যে-সব অন্ধ-সংস্কার বহুযুগ ধরে আমাদের হাড়ে হাড়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে তাদের উপড়ে ফেলে প্রাচীনের মধ্যে যেখানে প্রাণ ছিল তার পরিচয় লাভ করতে হবে এবং সেই প্রাণের ধারাকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিচিত্র বিবিধ রসে ও অভিনব গন্ধে ফুটিয়ে তুলতে হবে। জীবন-বাঁশীতে জাগরণের সুর তুলে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন যুগের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করবার ভার যাদের উপর, কি দুঃসাহসে বুক বেঁধে, কোন দুরাশায় মুগ্ধ হয়ে, কোন্ সে দুর্গম পথে তাদের ছুটতে হবে—হে তরুণের দল, সে কথা যদি একবার শুদ্ধ সমাহিত চিত্তে চিন্তা করে দেখ, তবেই বুঝতে পারবে যে, সে নূতন পথে পথিকের পাথেয় হচ্ছে অন্তর ও বাহিরের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। বিশ্বাসের হোমানল অন্তরে জ্বেলে, প্রবল ইচ্ছাশক্তির স্বচ্ছন্দ আহুতিদানে যিনি বাহিরকে উজ্জ্বল প্রকাশমান করে নিতে পারবেন, তিনিই সে পথের যাত্রী। যারা কপটচারী, যাদের মন মুখ এক নয়, সে পুণ্যপথে চলা দূরে থাক, তার সন্ধানেই তারা পাবে না।

অন্ধ দেশপ্রীতি সত্যের পথে বড় বাধা দেয়। আমাদের দেশের আচার-ব্যবহার বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতি যা কিছু সবই ভাল—এরূপ বিশ্বাসের দিকে যাঁদের মনের খুব ঝোঁক, কোনপ্রকার সংস্কারের কথায় তাঁরা কখনও আমলই দেবেন না।

এখন দেশের হাওয়া ক্রমে ফিরচে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন আমি হেয়ার

স্কুলে পড়ি, তখন কেশব সেন বিলাত গিয়েছেন ; দেশের শিক্ষিত মহলে তখন 'একেশ্বরবাদের আলোচনা চলছে। রাজনৈতিকদল তখন ছিল না বললেই চলে। সে সময় ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল মুন্সেফি বা ডেপুটিগিরি। কিন্তু এখন আমাদের আশা অনেক বেড়ে গেছে। এখন আমরা "রিফর্ম" পাচ্ছি। কয়েক বৎসর আগে গভর্নর-জেনারেলের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় (**Imperial Executive Council**) একজন ভারতবর্ষীয় সভ্য গ্রহণ করা হবে, এরূপ স্থির করা হয়। লর্ড মর্লি তাঁর "জীবন-স্মৃতি"-তে এই ঘটনাকে **A breach in oureaucracy** বলে উল্লেখ করেছেন। এখন ঐ কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় ভারতীয়সভ্যের সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে। যোগ্য ভারতবাসী ঐ সকল সভায় সভ্য হবেন এবং ক্রমে তাঁরা 'মিনিষ্টারের' পদে উন্নীত হতে পারবেন এমন আশা থাকবে। আবার শাসন-ব্যাপারে কতকগুলি কার্য্য সম্পাদনের ভার বিশেষভাবে তাঁদেরই উপর এসে পড়বে (**Transferred subjects**)। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁদের কার্য্যের প্রসার যথেষ্টই হবে। আমাদেরই একজন—লর্ড সিংহ আমাদেরই এক প্রদেশের গভর্নর হয়ে আসছেন। এই রিফরম্ ব্যাপারের ভালমন্দ বিচার আমি করছি না। রাজনৈতিক দলের মধ্যে আমি কেউ নই ; আমি বৈজ্ঞানিক মাত্র। আমার কথা শুধু এই যে, নানাদিকে দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে ; জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্য অনেক দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সেই সঙ্গে আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হয়ে পড়ছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এখন আমাদের সামনে পা ফেলে চলতে হবে এবং তার জন্যে নানাদিকে আমাদের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে—এই আমাদের প্রধান বক্তব্য।

দেশে নূতন যুগ আসছে। তাই আমাদের নূতন আয়োজনে অভিনব শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। বাঙলা দেশে আমাদের একটা সাংঘাতিক দোষ এই যে, আমরা সহজে ফাঁকি দিয়ে কাজ সেরে নিতে চাই ;—রীতিমত একটানা পরিশ্রম করে কার্য্য সম্পাদন করতে হলে আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। দেশের সহস্র কাজ আজ অসম্পন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। এখন শুধু চালাকির দ্বারা এই মহৎ কাজ সম্পন্ন হবার কোনো আশা আছে কি? সফলতার তো কোনো বাঁধা পথ নেই। "আলালের ঘরের দুলাল"-এর ঠগচাচার মত "ও মুই তুড়ি দিয়ে কেল্লা ফতে করব" ভাবলে কেল্লা ফতে হওয়া ত দূরের কথা, কর্ম্মের পথে এক পা অগ্রসর হওয়াও সম্ভব হবে না। সম্ভব যা হবে সে শুধু কথার ফাঁকা আওয়াজ—যা আমাদের দুনিয়ার সামনে ঘাড় আরও হেঁট করে দবে মাত্র—মিঞা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বেঁধে লড়াই করবার সাধে যে অবস্থা হয়েছিল। (এখন চাই কাজ ;—চীৎকার বা চালাকিতে আর চলবে না ; মুখে ছিপি এঁটে কথা বন্ধ করে স্থিরচিত্তে কাজের জন্য দম নিতে হবে।) "**Every-**

thing great was achieved in solemn silence"—লোকচক্ষুর অন্তরালে স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে প্রকৃত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে। আমরা বাঙালী বড় ভাবপ্রবণ জাতি। কিন্তু ভাবের মধ্যে গভীরতা নেই বলে স্বদেশী আন্দোলনের সময় তা কলেজ স্কোয়ারের গলাবাজিতেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল ;—শিল্পোদ্ধারকল্পে একটা ও আসল কাজের রীতিমত প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। ১৮ লক্ষ টাকা নিয়ে "বঙ্গলক্ষ্মী" কি করেছে ? কিন্তু এদিকে যুদ্ধের সুযোগে বোম্বাই কলওয়ালারা শতকরা দু তিন শ' টাকা লাভ দেখিয়েছেন। নাগপুরে "এম্‌প্রেস্‌ মিল" টাটার এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। কিন্তু বি এ,—এম এ পাশ করে যাঁরা চীৎকার করেন—তা বাঙালীই হন আর মাদ্রাজী বা মারাঠীই হন—তাঁদের ঐ ৪০৲, ৫০৲ টাকার চাকরিই সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে অবসাদের কারণ নেই। কতকগুলি বিষয়ে আমরা যে নিঃসন্দেহে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি, এইটেই আশার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমরা যত কটাক্ষই করি না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিদ্যাশিক্ষার ফলে দেশে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হচ্ছে। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে স্বাধীন গবেষণা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়ে সম্মান লাভ করা শুধু মুখস্থ বিদ্যার কর্ম্ম নয়,—একথা অবশ্য আজ কারও অবিদিত নেই। স্বাধীন অনুসন্ধানের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ক্রমে এমন সব তত্ত্ব বাহির হচ্ছে, যা আমরা সগৌরবে অন্য দেশের সুমুখে দাখিল করতে পারি। নানা ঘটনা-পরম্পরার সমবায়ে দেশে জাতীয় ভাব পুষ্টিলাভ করছে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রীতি ও সহনুভূতি ক্রমে ফুটে উঠছে। পাঞ্জাবের দুর্দ্দিনে ভারতের সমল স্থান থেকে ১৮।২০ হাজার শিক্ষিত লোক অমৃতসরে সমবেত হয়ে তাঁদের বেদনায় আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের দুঃখকে আপন দুঃখ বলে বরণ করে নিয়েছেন। তোমরা ও আমরা আজ সেই একই ভারতমাতার সন্তান—এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে জাতীয় জীবন বিকাশলাভ করছে। আবার দুর্ভিক্ষ বন্যা ও ঝঞ্ঝাপীড়িত হতভাগ্য দেশবাসীকে নানাভাবে সাহায্য করে সমাজসেবার আকাঙ্ক্ষা দেশের যুবকগণের মধ্যে জেগেছে। মহা সংক্রামক রোগ বা মহা বিপদ উপস্থিত হলে যখন সবাই আর্ত্তকে ফেলে পালায়, তখন এমন লোকও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যারা হাসিমুখে অকাতরে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলছে। প্লেগ-রোগ, বর্দ্ধমানে বন্যা ও পূর্ব্বঙ্গে ঝড় তার প্রধান সাক্ষী। এই সেবাব্রত দেশে একটা খুব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। তাই আজ মনে হয়, আমরা ধীরে ধীরে খাঁটি ও আসলের আদর করতে শিখছি। অনেক চিন্তা ও ভাব-বিপর্য্যয়ের পর আজ দেশের সাধনা ক্রমে অন্তর্ম্মুখী হচ্ছে এবং দেশের চিন্তাকেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই সকলই আশার কথা।

এই সূত্রে মাদ্রাজে "অব্রাহ্মণদের আন্দোলনে"র কথা মনে পড়ছে। ব্রাহ্মণই

অব্রাহ্মণকে বরাবর ঘৃণা করে এসেছেন। তাই "রিফরম্ বিল" পাশ হবার সময় থেকে অব্রাহ্মণ খুব সাবধানে আছেন—পাছে এই সামান্য রাজনৈতিক সুবিধার সবটুকু ব্রাহ্মণ একচেটে করে ফেলেন। কুপ্রথা হজম করে আসতে আসতে আমাদের সমাজে এতটা নৈতিক অবনতি হয়েছে যে, সামাজিক কুরীতির পরিবর্জ্জন সম্বন্ধে বুদ্ধির সায় (**Intellectual assent**) থাকলেও অন্তরের সাহসে আর কুলায় না। "পারিয়া অস্পৃশ্য"—একথা যুক্তি ও তর্কের দ্বারা শতবার অস্বীকার করলেও, কার্য্যতঃ আচরণে আমরা একথা শতবার স্বীকারই করেছি। তাই অন্যের কাছে আপনাদের রাজনৈতিক অধিকার ভিক্ষা করলেও, আপন দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ জনসাধারণকে আমরা সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি। বিদেশীর নিকট আমরা যে অধিকার ভিক্ষা করি, স্বদেশবাসীর ঠিক সেই রকম জন্মগত অধিকার কেড়ে নিয়ে তার উপর অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত হই না। যাহোক, এই রিফর্ম্ম-সূত্রে সকলশ্রেণীর লোককে ক্রমে মিলতেই হবে। **Creation of Electorate** হচ্ছে রিফর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যসংখ্যা এখন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের সকল স্থানের লোকেরই আপন আপন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করার ক্ষমতা থাকবে। কাজেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, শূদ্র সকল জাতির প্রতিনিধিকেই এখন ব্যবস্থাপক সভায় পাশাপাশি বসতে হবে। তখন আর জাত ছুঁৎ মানলে চলবে না। আমরা এক দেশমাতার সন্তান সবাই এক—আজ পর্য্যন্ত যাদের অবজ্ঞা করে এসেছি তাদের কোলে টেনে নিতে হবে; যাঁরা এতদিন দূরে সরে ছিলেন তাঁদেরও জোর করে বাধা-সঙ্কোচ ঠেলে এগিয়ে আসতে হবে। তার পরিণামে যদি সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হয় সেও ভাল। এমার্সন বলেছেন—"**Heroism consists not only in facing cannon ball but also in facing social ostracism**"—"কামানের গোলার মুখে দাঁড়ানোই কেবল বীরত্ব নয়, সমাজে একঘরে হওয়ার ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়ানোও সমান বীরত্ব।"

বাঙালীর সুখ্যাতি গোখলে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"**What Bengal thinks today India thinks tomorrow**"—বাঙলা আজ যা চিন্তা করে, সারা ভারতবর্ষ কাল সেই চিন্তা গ্রহণ করে। বাঙালীর পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নয়। কিন্তু লাট-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যাপারে মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্র দেশের কাছে বাঙলা হার মেনেছে। গোখলে ঐ সভার সভ্য ছিলেন; শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বর্ত্তমানে সভ্য আছেন। এঁরা ধনী নন, কিন্তু জ্ঞানী ও কর্ম্মক্ষম। বাঙলা থেকে উপস্থিত যে-সকল প্রতিনিধি লাট-সভায় গিয়েছেন তাঁদের ধন আছে কিন্তু দেশ সম্বন্ধে কোনো গুরুতর ব্যাপারে আলোচনা করার শক্তি তাঁদের কম। বাঙলায় রাজা-রাজড়া না হলে মেম্বার হয় না; কিন্তু মাদ্রাজে তা নয়। বাঙলা এইখানে পশ্চাতে।

বাঙলায় এক অন্নসমস্যাই মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙলায় স্বাস্থ্যহানি, উৎসাহহীনতা, কর্ম্মবিমুখতা—এ সবের মূলে ঐ অন্নসমস্যা। পেট ভরে পুষ্টি-কর খাদ্য খেতে না পেলে বাঙালী ক্রমে কাজের বাহির হয়ে পড়বে ; ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে। তাই বলি, আজ আমাদের কড়া ও ঝাঁজালো বক্তৃতা ছেড়ে কাজের হাতেখড়ি হওয়া চাই। আর কথা নয়—এখন শুধু কাজ। কিন্তু যে-কাজ সম্পাদন করতে পারলে বাঙলার, মহাসমস্যার মীমাংসা হবে, সেই কাজের প্রেরণা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে আসা চাই। বাঙালীর আত্মার জাগরণ চাই। আত্মিক শক্তির বলেই বাঙালী তার জীবনপথের সকল বাধাগুলি ঠেলে দিয়ে জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। তাই আজ আত্মার মধ্যে আমাদের শক্তির কেন্দ্র খুঁজে বার করতে হবে—কেন্দ্রের সন্ধান পেয়ে, সেইখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, জীবন-সংগ্রাম জয়লাভ হবেই হবে।*

* বক্তৃতাটি প্রবাসী ১৩২৭, আশ্বিন সংখ্যা হতে সংক্ষেপিত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের
অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ*

[এক]

College of Science
26. 2. 27.

My dear Dhiren,

তোমার পত্র পাইলাম। সুতা যে পরিমাণ তৈয়ারী হইবে ঠিক সেই পরিমাণে ইহা খরচ করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁতে সেই পরিমাণ কাপড় তৈয়ারী করিতে হইবে। জানিতে দিলেই মুস্কিল বাধিবে। এখানে মোটা সুতার আদৌ বাজার নাই। যাহা হউক, আপাততঃ সুতা জমা হউক। তোমরা যে এতগুলি তাঁত বানাইয়াছ সেগুলিতে ঠিক কাজ হইতেছে না? আমরা এখানে চরকার উপযোগী লম্বা আঁশওয়ালা (**Long stapled**) সুতা ৪।। বা ৫ মন এক গাঁইট পাঠাইতেছি। আর জামার উপযোগী এক গাঁইট সুতাও পাঠাইতে প্রস্তুত। তবে কত নম্বর হইলে ভাল হয় জানাইবে। হাতনাগত যত সুতা পাইয়াছ তাহার পরিষ্কার হিসাব রাখিবে। আমি বাড়ী যাইয়া তন্ন ২ করিয়া পরীক্ষা করিব। ফলকথা সঙ্গে ২ তাঁতের কাজ বাড়াইতে না পারিলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে। আমি কাল জ্যোতিষ বাবুকে লিখিয়া দিয়াছি যে আমার মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি **Benaras Hindu** University-তে যাইতে হইবে। সুতরাং মার্চ্চের শেষভাগে বা এপ্রিলের প্রথম ভাগে ভিন্ন বাড়ী যাইতে পারিব না।

Yours Sincerely,
P. C. Ray

[দুই]

বাগেরহাট
১৮. ৫. ২৮

My dear Dhiren,

আমি এখান হইতে আগামী কল্য যাত্রা করিয়া রবিবার প্রত্যুষে সাতক্ষীরা ষ্টীমারে চালনায় (বাজুয়া) রওনা হইব। সেখানে সম্ভবত ২ দিন অবস্থিতি করিতে হইবে। সম্ভবতঃ ২২।২৩ মে ষ্টীমারে পুনরায় রাবুলী অভিমুখে রওনা হইব। আশা করি তোমরা উভয়দিনই আমাকে প্রতীক্ষা করিবে। এতদিন বোধহয় চাউল অথবা চাউলের রসিদ তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে।

Yours Sincerely,
P. C. Ray

---

* পত্রগুলি আচার্যদেবের স্বগ্রামবাসী, এবং চরকা ও গ্রামসেবা আন্দোলনের সহিত যুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিদাস ঘোষকে লিখিত।

[তিন]

93, Upper circular Road,
Calcutta, 11. 2. 28

My dear Dhiren,

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া দাদা ও ননীর সহিত দেখা করি। আমি তিন সপ্তাহ অনুপস্থিত ছিলাম, কাজেই অনেক কাজ হাতে জমিয়াছে। যাহা হউক, অতি শীঘ্রই যে খসড়া দিয়াছিলে তাহা উভয় পক্ষের সমতা রক্ষা করিয়া অদল বদল পূর্ব্বক শীঘ্রই পাঠাইব। এবং যত শীঘ্র হয় Registry হইবে। ইতিমধ্যে পূর্ব্বেকার কথামত আদায় তহশীল করিয়া যাও এবং খাতাপত্র যাহাতে দোরস্ত হয় তাহা মেনুর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির কর।

Yours Sincerely,
P. C. Ray

[চার]

Khulna
26. 2. 22

My dear Dhiren,

তোমার পত্র পাইলাম। আমরা আর চরকার order দিব না। Return পাইলে সুতার কি ব্যবস্থা করা যায় দেখিব। দেখা না হইলে সমুদায় মীমাংসা করা যায় না। Pass বই Dr. Ray এর কাছে পাঠাইয়াছ কি?

Yours Sincerely,
P. C. Ray

[পাঁচ]

বাগেরহাট
১৯. ৫. ২৮

My dear Dhiren,

আজ বাগেরহাট হইতে রওনা হইতেছি। কল্য প্রত্যুষে চালনা রওনা হইব। বাজুয়াতে দিন দুই থাকিয়া ২২শে অথবা ২৩শে অথবা ২৪শে মে আশা করি রাবুলী পৌঁছব। তোমরা প্রত্যহ এক আধজন লোক আশা করি ঘাটে মোতায়েন রাখিবে। ইতি

Yours Sincerely,
P. C. Ray

[ছয়]

My dear Dhiren,

তোমার পোস্টকার্ড পাইলাম। আমি এতদিন ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম। এজন্য তোমার কার্ডের জবাব দিতে পারি নাই। যে চাউলের বস্তাগুলি নষ্ট হইয়াছে উহাদের স্থানে ভালো বস্তা কিনিয়া চাউল পুরিবে। আবার যেগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে আশঙ্কা কর সেগুলি অচিরে আশাতলি সেবাশ্রমে পাঠাও। পূর্ব্বেকার যে ৬।৷৴ লাগিয়াছে এবং আর নূতন যাহা কিছু খরচ পড়িবে তাহার হিসাব রাখ। সমস্ত একসঙ্গে পরিশোধ করিয়া দিব। ইতি

Yours Sincerely,
P. C. Ray

[সাত]

College of Science

My dear Haridas,

আমি কাল সন্ধ্যাবেলা বাঁকুড়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। চরকা কতগুলি ও কি প্রকার চলিতেছে জানিতে ইচ্ছা করি। মাসে কত ওজনের সুতা তৈয়ারী হইতেছে, একমণ অতিক্রম করিয়াছে কিনা, দেশের অবস্থা বা কি প্রকার জানাইবেন।

Yours Sincerely,
P. C. Ray

[আট]

Science College
19. 4. 25

My dear Haridas Babu,

এইমাত্র জ্যোতিশ বাবুর সহিত কথা হইল। ২৭শে মে মহাত্মা গান্ধি খুলনায় যাইবেন। তারপর Dist Conference করা অনাবশ্যক এবং যথেষ্ট লোকসংখ্যা উপস্থিত হইবার জন্য সম্ভব নহে।

আগামী শীতকালে Conference করাই ভাল। এই সময় আমার নিজের উপস্থিত থাকা অসম্ভব। আপনি অভ্যর্থনা সমিতিকে আমার মত জানাইবেন এবং কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

Yours Sincerely,
P. C. Ray

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচিত গ্রন্থসমূহের তালিকা

ইংরাজী

1. India before and after the Mutiny—Edinburgh, 1885
2. Essay on India—Edinburgh, 1886
3. Chemical Research of the Presidency College—Calcutta Hare Press, 1895, 1897
4. A History of Hindu Chemistry—Vol. I. Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd., Calcutta, 1902 Vol. II. Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd., 1909
5. Elementary Inorganic Chemistry—Calcutta, 1909 ; 2nd Edition, 1910
6. Bengali Brain and Its Misuses—City Book Society, Calcutta, 1910
7. Essays and Discourses : G. A. Natesan & Co., Madras, 1918
8. Desi Rang—Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd., Calcutta, 1922
9. Makers of Modern Chemistry—Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd., Calcutta, 1925
10. The Discovery of Oxygen—Calcutta University, 1926
11. Radha Charan Pal—A Study, Calcutta, 1931
12. Life and Experiences of a Bengali Chemist Vol. I. (1932) & Vol. II. (1935) Chuckervertty, & Co Ltd., Calcutta

বাংলা

১। সরল প্রাণিবিজ্ঞান। চেরী প্রেস, কলিকাতা, ১৯০২
২। নব্যরসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১০

৩। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১০

৪। রাসায়নিক পরিভাষা। সহ-গ্রন্থকার শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলিকতা, ১৯১৯

৫। সমাজ সংস্কার সমস্যা। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস, ১৯১৯

৬। জাতিভেদ ও পাতিত্য-সমস্যা। বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টীম প্রেস, কলিকাতা, ১৯২০

৭। অন্নসমস্যা। কলিকাতা, ১৯২০, ১৯২২

৮। অধ্যয়ন ও সমস্যা। মডার্ন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯২০, ১৯৩৩

৯। জাতি গঠনে বাধা—ভিরতে ও বাহিরে। চক্রবর্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, ১৯২১

১০। দেশী রঙ। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং কলিকাতা, ১৯২২

১১। বস্ত্রসমস্যা। বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টীম প্রেস, কলিকাতা, ১৯২২

১২। মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তিক্রয়। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, ১৯২৫

১৩। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, (১ম ভাগ—৩য় সংস্করণ)। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৮

১৪। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, (২য় ভাগ)। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩১

১৫। চা পান ও দেশের সর্বনাশ। কলিকাতা, ১৯৩২

১৬। অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৬, ১৯৪০

১৭। জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৬, ১৯৪০

১৮। খাদ্য-বিজ্ঞান। সহ-গ্রন্থকার শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৬

১৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা ও শিল্প ও ব্যবসায়ে কৃতিত্বলাভ। কলিকাতা, ১৯৩৭

২০। আত্মচরিত। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৭

২১। হিন্দুরসায়নী বিদ্যা। (শ্রীভবেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সংকলিত), কলিকাতা, ১৯৩৭

২২। আচার্য-বাণী (৩ খণ্ডে সমাপ্ত—শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়, বি. এ. কর্ত্তৃক সংকলিত)। বুক করপোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৫৩, ১৯৫৫

পুস্তিকা ও প্রবন্ধ

১। বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতের স্থান নির্ণয়। সহ-লেখক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। প্রবাসী, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩২৯, পৃঃ ৩১৫

২। ভোগের অনাচার—প্রবাসী, কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ৪৭৫

৩। শুভমস্তু—প্রকৃতি (১ম বর্ষ), কলিকাতা, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ১-৪

৪। প্রাণীদের দংশন কাহাকে বলে ? প্রকৃতি (১ম বর্ষ), কলিকাতা, ১৩৩১ বাং, পৃঃ ২৮৩-২৯০

৫। প্রকৃতির আহ্বান—প্রকৃতি (২য় বর্ষ), কলিকাতা, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ১-৩

৬। প্রার্থনা—প্রকৃতি (২য় বর্ষ), কলিকাতা, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ২৮৫-২৮৬

৭। খুলনা জেলা সম্মিলনীতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ—বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস, কলিকাতা, ১৯২৫

৮। অক্সিজেনের আবিষ্কার, প্রকৃতি (৪র্থ বর্ষ), কলিকাতা, ১৩৩৪ বাং, পৃঃ ১০৪-৮

৯। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা—ফরিদপুর জেলা ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ, ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৫

১০। অন্নসমস্যা ও বাঙালীর নিশ্চেষ্টতা—মাসিক বসুমতী (১ম বর্ষ), ফাল্গুন পৃঃ ৫৪৯

১১। রসায়ন শাস্ত্র—নব্য ও প্রাচীন—মাসিক বসুমতী (২য় বর্ষ), অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৩৭

১২। কোকনদা কংগ্রেস—মাসিক বসুমতী (২য় বর্ষ, ২য় ভাগ), পৃঃ ৪৩৮

১৩। বর্তমান সমস্যা—মাসিক বসুমতী (৩য় বর্ষ), আষাঢ়, পৃঃ ৩২৫

১৪। সুরেন্দ্রনাথের তিরোধান—মাসিক বসুমতী (৪র্থ বর্ষ), ভাদ্র, পৃঃ ১

১৫। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—মাসিক বসুমতী, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৩৮১

১৬। কলিকাতা ও শহরতলী—মাসিক বসুমতী, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৩৬৭, ১৩৩৩ বাং, পৃঃ ২৭

১৭। শ্রমের মর্যাদা—বাঙ্গালীর পরাজয়—মাসিক বসুমতী, ১৩৩৯ বাং, পৃঃ ৫৩২

১৮। চরকা ও বস্ত্র সমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্তব্য—প্রবাসী, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ২৫৩

১৯। দেশের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুটো কথা—প্রবাসী ১৩৩৩ বাং, পৃঃ ১২৭

২০। বাঙ্গালী কোথায় গেল ?—প্রবাসী, ১৩৩৯ বাং, পৃঃ ৮৩৮

২১। কোকনদা খদ্দর প্রদর্শনী—প্রবাসী, ১৩৩৩ বাং, পৃঃ ৭৯৫
২২। অন্নসমস্যা ও গো-পালন—প্রবাসী, ১৩৪২ বাং, পৃঃ ৬১০
২৩। ছুটির অবকাশে ছাত্রদের কর্তব্য—ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৬ বাং, পৃঃ ৪৯৫
২৪। ডিগ্রির অভিশাপ—ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বাং, পৃঃ ৮২৫
২৫। ভাইটামিন—ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৪১ বাং, পৃঃ ৮২৩, ১
২৬। প্রবাসী জমিদার ও দুরস্থ পল্লী (১ম ভাগ), সহ-লেখক শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস—ভারতবর্ষ, ভাদ্র ও কার্তিক, ১৩৪০ বাং, পৃঃ ৩২৯, ৭৯
২৭। বাঙলার জমিদারবর্গ—ভারতবর্ষ, ১৩৪০ বাং, পৌষ হইতে, পৃঃ ২০, ৪৩২, ৮৩৩
২৮। বস্ত্র সমস্যা—বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ৬৭৪
২৯। বন্যার শিক্ষা—বঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ১২৭
৩০। প্রাচীন ভারতে রসায়ন-শাস্ত্রচর্চা—বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ বাং, পৃঃ ৪২১
৩১। দিনাজপুর রাষ্ট্রীয় সমিতিতে অভিভাষণ—বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩১ বাং, পৃঃ ৬৬৯
৩২। বর্তমান যুগসমস্যা ও ছাত্রগণের কর্তব্য—বঙ্গবাণী, কার্তিক, ১৩৩৯ বাং, পৃঃ ৩৫১
৩৩। স্মৃতিতর্পণ—বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৭০২
৩৪। বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাংলা, সহ-লেখক শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ, বঙ্গবাণী, ভাদ্র, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৪১
৩৫। স্বদেশী—বাংলার বাণী (৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা), পৃঃ ৯
৩৬। কলিকাতা ষাট বৎসর পূর্বে ও এখন—আনন্দবাজার পত্রিকা
৩৭। বাঙালী কোথায়? আনন্দবাজার পত্রিকা (পূজা সংখ্যা), ১৩৩৯ বাং, পৃঃ ৬

স্বীকৃতি : Acharya Prafulla Chandra Ray (Birth Centenary Souvenir Volume) C. U. Calcutta, 1962

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

খ্রীস্টাব্দ

১৮৬১—২রা আগষ্ট, কপোতাক্ষ-তীরবর্তী যশোহর জেলার (পরে খুলনা জেলা) অন্তর্গত রাড়ুলি-কাটিপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা—বহু ভাষাবিদ্, সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী হরিশ্চন্দ্র রায় ; মাতা—ভুবনমোহিনী দেবী।

(১৮৬৬-৭০)—গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ।

১৮৭০—আগষ্ট মাসে কলিকাতায় আগমন।

১৮৭১—হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন শুরু।

(১৮৭২-১৮৭৩)—আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের বাড়ীতে আগমন। পিতৃদেবের বিরাট পাঠাগারে নিজের উদ্যোগে নিরলস অধ্যয়ন।

১৮৭৪—কলিকাতায় কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত এ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি।

১৮৭৮—এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৭৯—বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যয়ন শুরু।

১৮৮১—এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৮২—বি. এ. পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি। গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ড গমন।

(১৮৮২-৮৪)—এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর বি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ।

১৮৮৫—'India before and after the Mutiny' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। বৃটিশ সরকারের সমালোচনার জন্য পুরস্কারলাভে বঞ্চিত কিন্তু গুণীজনের প্রশংসালাভ।

১৮৮৬—'Essays on India' প্রবন্ধ প্রকাশ ও খ্যাতিলাভ।

১৮৮৭—এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি উপাধিলাভ। 'Hope Prize' বৃত্তিলাভ।

১৮৮৮—স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন। ফ্রান্স ও ইতালি হয়ে রেলপথে ব্রিন্দিসি বন্দরে গমন। সেখান থেকে জাহাজযোগে আগষ্ট মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৮৮৯—মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান।

১৮৯১—অনিদ্রারোগে আক্রান্ত। পূজার ছুটিতে দেওঘর গমন। রাজনারায়ণ বসু, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ মনীষিগণের সঙ্গলাভ। ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে বসবাস শুরু।

১৮৯২—দেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণা। বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সূচনা।

১৮৯৩—স্বগ্রামবাসী যাদবচন্দ্র মিত্রের নিকট থেকে সালফিউরিক এসিড প্ল্যাণ্ট ক্রয়।

১৮৯৪—'Journal of the Asiatic Society of Bengal'-এ তৈল ও ঘৃতে ভেজাল সম্পর্কে রাসায়নিক প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৮৯৬—'Mercurous Nitrite' আবিষ্কার। Journal of the Asiatic Society of Bengal-এ প্রবন্ধ প্রকাশ। পিতা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু।

১৮৯৮—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কংগ্রেসের অধিবেশন—তাঁর প্রস্তুত দেশীয় ভেষজের কার্যকারিতার প্রশংসা—বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় স্থানলাভ।

১৯০১—বেঙ্গল কেমিক্যালকে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর।

১৯০১—গোখেল ও গান্ধীজির সঙ্গে পরিচয় ও সৌহার্দ্য।

১৯০২—আচার্যদেবের উদ্যোগে কলিকাতা টাউন হলে ভারতে গান্ধীজির প্রথম বক্তৃতাদানের আয়োজন।

১৯০২—'সরল প্রাণি-বিজ্ঞান' গ্রন্থ প্রকাশ।

—'History of Hindu Chemistry' Vol I গ্রন্থাকারে প্রকাশ। মসিয়েঁ বার্থেলো প্রমুখ মনীষীদের প্রশংসালাভ।

১৯০৩—স্বগ্রামে পিতা হরিশ্চন্দ্র রায়ের নামে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন।

১৯০৪—দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড গমন। ইউরোপের গবেষণাগারসমূহ পরিদর্শনের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রেরিত। লণ্ডন, ডাণ্ডি, লিডস, ম্যানচেষ্টার, বার্মিংহাম, বার্ণ, জেনেভা, জুরিখ, ফ্রাঙ্কফুর্ট ইত্যাদি স্থানের ল্যাবরেটরী পরিদর্শন শেষে ফ্রান্সে গমন। বড়দিনের ছুটিতে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণ কর্তৃক বিপুল সম্বর্ধনা।

১৯০৯—'History of Hindu Chemistry—Vol II' গ্রন্থ প্রকাশ। প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে উন্নীত। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, মানিকলাল দে, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পুলিনবিহারী সরকার, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ ছাত্রদের প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান এবং আচার্যদেবের বাস-ভবনে তাঁর সাথে একত্রে অবস্থানের সূত্রপাত।

১৯১০—রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯১১—The Congress of the Universities of the Empire-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তৃতীয়বার ইংলণ্ড গমন, সঙ্গে ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী।
—সি. আই. ই. উপাধিলাভ।

১৯১১—ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারি ডি. এস-সি. উপাধিলাভ।

১৯১৪—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদান।

১৯১৬—প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পালিত' অধ্যাপকরূপে যোগদান।

১৯১৭—ভারতীয় জাতীয় সমাজ-সংস্কার সমিতির সভাপতি নির্বাচিত।

১৯১৮—বাগেরহাট কলেজ স্থাপন। স্বগ্রামে 'Education Society' কে দুঃস্থ ছাত্র ও বিধবাদের সাহায্যকল্পে বেঙ্গল কেমিক্যালের নিজস্ব ১০ হাজার টাকার শেয়ার দান।

১৯১৯—'নাইট' উপাধিলাভ। রাউলাট বিলের প্রতিবাদ সভায় টাউন হলে বক্তৃতা দান।

১৯২০—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত। চতুর্থবার ইংলণ্ড গমন।

১৯২১—খুলনার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের অন্নদানে রিলিফ কমিটি স্থাপন ও আর্থিক সাহায্য দান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০,০০০ টাকা দান এবং 'নাগার্জুন' পুরস্কার স্থাপন।
(১৮৮৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দান।)

১৯২২—উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে আত্মনিয়োগ। কয়েক লক্ষ টাকা, প্রচুর অর্থ, ঔষধ ও খাদ্য সংগ্রহ এবং বন্যা পীড়িতদের মধ্যে বিতরণ। ডাঃ ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের সক্রিয় সহযোগিতা। চরকা প্রচলনে আত্মনিয়োগ। কাটিপাড়া সেবাশ্রমে চরকার উন্নতিকল্পে বেঙ্গল কেমিক্যালের এক হাজার টাকার শেয়ার দান। চরকা ও খাদি প্রচলনের জন্য খাদি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা দান।

১৯২৩—আমেদাবাদে আমেদাবাদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। উৎকল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত। 'Indian Chemical Society' স্থাপন। উহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত।

১৯২৫—সিউড়ী মেলার উদ্বোধন; শান্তিনিকেতন পরিদর্শন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দান। কোকনদে কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধিরূপে যোগদান।

১৯২৬—পঞ্চমবার ইংলণ্ড গমন এবং বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন।

১৯৩১ - উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে পুনরায় বন্যা। বঙ্গীয় সংকট ত্রাণ সমিতি গঠন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত। সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে টাউন হলে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক সম্বর্ধিত। সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্বর্ধনার দিন ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯।

১৯৩২—'**Life and Experiences of a Bengalee Chemist**' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩২—**Calcutta Review** পত্রিকায় '**The Shakespearean Puzzle**' নামে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ।

(১৯৩১-৩৪)—পরপর তিনবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৩৪—লণ্ডনের **Chemical Society**-এর অনারারি ফেলো নির্বাচিত।

১৯৩৬—৭৫ বছর বয়সে রসায়নের 'পালিত' অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দানের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।

(১৮৯৪-১৯৩৬)—দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রসায়ন সম্পর্কিত তিন শতাধিক গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ।

১৯৩৭—প্রাণি-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য 'আশুতোষ প্রাইজ' খাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২০ হাজার টাকা দান। পাটনার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৪০—বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালক সমিতির সহিত মতভেদের ফলে সভাপতিত্ব ত্যাগ।

১৯৪১—সিনেট হলে অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসব।

১৯৪১—খুলনা শহরে খুলনাবাসীদের পক্ষ থেকে অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

১৯৪৩—রাড়ুলির অধিবাসীগণ কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

১৯৪৪—৮৩ বছর বয়সে ১৬ই জুন পরলোক গমন।

স্বীকৃতি : মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়' পুস্তকের ভিত্তিতে সংকলিত।